কবিতা

ত্রৈমাসিক পত্র

সম্পাদক : বুদ্ধদেব বসু : প্রেমেন্দ্র মিত্র : সহকারী সম্পাদক : সমর সেন

বার্ষিক সূচীপত্র

দ্বিতীয় বর্ষ : আশ্বিন, ১৩৪৩—আষাঢ় ১৩৪৪

[শেষের সংখ্যা পৃষ্ঠাসূচক]

অজিত দত্ত
রাঙা সন্ধ্যা, চৈত্র, ... ৩৬
অনুপম গুপ্ত
মুক্তি না মৃত্যু, চৈত্র, ... ৩১
কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
ঝরনা, চৈত্র, ... ৩৫
কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত
শত্রু, আশ্বিন, ... ৩০
দৃষ্টান্ত, „ ৩১
ছায়া দেবী
অনন্য, আষাঢ়, ... ৩৯
জীবনানন্দ দাশ
নগ্ন নির্জন হাত, আশ্বিন, ... ১১
শিকার „ ... ১৪
"বলিল অশ্বত্থ সেই" „ ... ১৭
নদী „ ... ১৯
হাজার বছর শুধু খেলা করে „ ... ২০
সিন্ধুসারস পৌষ, ... ১৩
রাত্রিমাখা ঘাসে „ ... ১৭
স্বপ্ন „ ... ১৯
হরিণেরা „ ... ২০

জীবনানন্দ দাশ

শ্রাবণরাত	চৈত্র,	...	২৩
বিড়াল	"	...	২৫
আদিম দেবতারা	আষাঢ়,	...	১৭
মুহূর্ত্ত	"	...	১৯

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মৈত্র

আমার এ রাত ত ভ্রমর	আশ্বিন,	...	২৩
গুহার গান	চৈত্র,	...	৫
জাতক	"	...	৭
সনেট	"	...	১১
শিকারী	আষাঢ়,	...	৪১
চৈত্র-চূর্ণি	"	...	৪৫

দ্বিজেন্দ্র মৈত্র

বিস্ময়	আশ্বিন,	...	৪২
একটি সূর্য্যাস্ত	পৌষ,	..	২৯
তাজমহল	"	...	৩০
সূর্য্যমুখী	আষাঢ়,	...	৩১
বাঁশী	"	...	৩২

নতুন কবিতা (সমালোচনা)

আশ্বিন, ৪৮	পৌষ,	...	৪০

প্রতিভা বসু

বিরহ	পৌষ,	...	২৬
পরিচ্ছেদ	"	...	২৭

প্রভু গুহঠাকুরতা

প্রশ্নের উত্তর	পৌষ,	...	৪২

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

প্রতিষ্ঠা	আষাঢ়,	...	২৩

বিষ্ণু দে

প্রার্থনা	আশ্বিন,	...	৩৫
যযাতি	পৌষ,	...	৩২
ডি, এইচ, লরেন্সের কয়েকটি অনুবাদ	চৈত্র,	...	১২
টপ্পা-ঠুংরি	আষাঢ়,	...	৪

বুদ্ধদেব বসু

সময় নেই	আশ্বিন,	...	৪
গানের মধ্যে গান	"	...	৬
তুমি যখন চুল খুলে দাও	"	...	১০
মুখ	পৌষ,	...	৩৩
ব্রাউনিঙের অনুসরণে	"	...	৩৫
নাম	"	...	৩৬
কার্ত্তিক	"	...	৩৮
ইকনমিক্স	চৈত্র,	...	১
এখন যুদ্ধ পৃথিবীর সঙ্গে	আষাঢ়,	...	৪৯

মিহিরকুমার বসু

পাহাড়ের রহস্য	আষাঢ়,	...	২০

মোহিত দাশগুপ্ত

আত্ম-ইতিহাস	আশ্বিন,	...	২৬

যুবনাশ্ব

ইণ্টের ক্লাস	আশ্বিন,	...	৩৭
একটি কথা	"	...	৪০
শীতলপাটি	চৈত্র,	...	২৯

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বপ্ন	আশ্বিন,	...	১
মুক্তপথে	পৌষ,	...	১
গদ্যছন্দ (প্রবন্ধ)	"	...	৪৬
স্মরণ	আষাঢ়,	...	১

লীলাময় রায়

চিঠি-পত্র	চৈত্র,	...	৬২

লীলাময় বসু

বন	আষাঢ়,	...	২৭

সমর সেন

অগ্নিবর্ণ	আশ্বিন,	...	২১
বসন্ত	"	...	২২
মরুভূমিতে মৃত্যু	পৌষ,	...	২১
বসন্তের গান	চৈত্র,	...	৩৭
অখ্যাত নায়ক	আষাঢ়,	...	৪৮

সম্পাদকীয় প্রবন্ধ			
জি, কে, চেস্টার্টন	আশ্বিন,	...	৫১
ছুই ও তিন	„	...	৫৩
প্রকৃতির কবি	চৈত্র,	...	৩৯
নবযৌবনের কবিতা	আষাঢ়,	...	৫১
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত			
বাতায়ন	আশ্বিন,	...	৩২
সমাপ্তি	পৌষ,	...	৩৯
অকৃতজ্ঞ	চৈত্র,	...	২৬
প্রার্থনা	আষাঢ়,	.	৩৪
সুরেশ্বর শর্ম্মা			
প্রশস্তি	চৈত্র,	...	৩০
সুশীলকুমার ঘোষ			
মনুমেণ্ট	আষাঢ়,	...	২৯
স্মৃতিশেখর উপাধ্যায়			
কবিতা	আশ্বিন,	...	৪৩
গান	„	...	৪৬
হাউই	পৌষ,	...	৪১
হেমচন্দ্র বাগচী			
গীতিগুচ্ছ	পৌষ,	...	৪
নির্জ্জন অলস মধ্যাহ্নের সুর	চৈত্র,	...	১৯
নবজন্ম	আষাঢ়,	...	১০
"স্বপ্নো নু, মায়া নু, মতিভ্রমো নু"	„	...	১২
প্রলাপ	„	...	১৪
দেবদারু ও চাঁদ	„	...	১৬

কবিতা

দ্বিতীয় বর্ষ আশ্বিন, ১৩৪৩ প্রথম সংখ্যা

স্বপ্ন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঘন অন্ধকার রাত,
বাদলের হাওয়া
এলোমেলো ঝাপট দিচ্চে চারদিকে।
মেঘ ডাকছে গুরুগুরু,
থরথর্ করছে দরজা,
খড়খড় করে উঠছে জানলাগুলো।
বাইরে চেয়ে দেখি
সার-বাঁধা সুপুরি নারকেলের গাছ
অস্থির হয়ে দিচ্চে মাথা ঝাঁকানি।
দুলে উঠছে কাঁঠাল গাছের ঘন ডালে
অন্ধকারের পিণ্ডগুলো
দল পাকানো প্রেতের মতো।
রাস্তার থেকে পড়েছে আলোর রেখা
পুকুরের কোণে
সাপ খেলানো আঁকাবাঁকা।

মনে পড়ছে ঐ পদটা—
"রজনী সাঙন ঘন ঘন দেয়া গরজন
...স্বপন দেখিনু হেনকালে।"
সেদিন রাধিকার ছবির পিছনে
কবির চোখের কাছে
কোন্ একটি মেয়ে ছিল,
ভালোবাসার কুঁড়িধরা তার মন,
মুখচোরা সেই মেয়ে,
চোখে কাজল-পরা,
ঘাটের থেকে নীলসাড়ি
নিংড়ে নিংড়ে চলা।

আজ এই ঝোড়ো রাতে
তাকে মনে আনতে চাই,
তার সকালে তার সাঁঝে,
তার ভাষায়, তার ভাবনায়,
তার চোখের চাহনিতে,
তিনশো বছরের আগেকার
কবির জানা সেই বাঙালির মেয়েকে।

দেখতে পাইনে স্পষ্ট ক'রে।
আজ সে পড়েছে যাদের পিছনের ছায়ায়
তারা সাড়ির আঁচল যেমন ক'রে বাঁধে
কাঁধের পরে,
খোঁপা যেমন ক'রে ঘুরিয়ে পাকায়
পিছনে নেমে-পড়া,
মুখের দিকে যেমন করে চায় স্পষ্টচোখে
তেমন ছবিটি ছিল না
সেই তিনশো বছর আগেকার কবির সামনে।
তবু—"রজনী সাঙন ঘন
...স্বপন দেখিনু হেনকালে।"—
শ্রাবণের রাত্রে এমনি ক'রেই বয়েছে সেদিন
বাদলের হাওয়া,
মিল রয়ে গেছে
সেকালের স্বপ্নে আর একালের স্বপ্নে।

৩০ মে, ১৯৩৬
শান্তিনিকেতন

সময় নেই

বুদ্ধদেব বসু

আমি অপেক্ষা করতে পারতুম তোমার জন্য :
তলোয়ারের মত দীর্ঘ দীপ্ত দিন ;
ডালে আর পাতায় আর হাজার অদৃশ্য পাখির উপনিবেশে মর্মরিত
গাছের মত রাত্রি ;
আমি অপেক্ষা করতে পারতুম ঋতুর পর ঋতুর আবর্তনে,
রামধনু-রঙিন বছরগুলির চিরঘূর্ণ্যমান চাকার ভিতর দিয়ে ;
সূর্য্য যখন দক্ষিণে আর দিন ছোট, আমি সুগন্ধি তন্দ্রার মধ্যে তোমার
কথা ভাবতুম ;
সূর্য্য যখন উত্তরে, আমি সূর্য্যাস্তের আকাশের দিকে উড়িয়ে দিতুম
আমার ভাবনাগুলি
সাদা পায়রার ঝাঁকের মত—
তাদের ডানার হাওয়া কবিতার সুর।

এমনি ক'রে একদিন মিলনের সময় আসতো।
তোমার চুলের গন্ধ দুরন্ত মৌশুমি হাওয়ার মত আছাড় খেয়ে পড়তো বুকের উপর,
আর আমার গানের গুঞ্জন পূর্ণিমার চাঁদ হ'য়ে উঠতো
তোমার চিরন্তন মুখের উপর স্তব্ধ।

কিন্তু সময় নেই।
রাতের পর রাত চাঁদ কৃশ হ'য়ে আসে, চাঁদ ক্ষ'য়ে যায় ; আর আমরা
আমরাও ক্ষ'য়ে যাই প্রতিদিনের, প্রতিরাত্রির বাঁচায় :
আজ কৃষ্ণপক্ষের রাত, চাঁদ দেরি ক'রে উঠবে ; অন্ধকার আকাশে
তারাগুলি বিরহের অশ্রুর মত :
কিন্তু আমি জানি একদিন পশ্চিমের আকাশে তাকিয়ে আবার দেখবো
নতুন চাঁদের জলন্ত শিখা ; চাঁদ ফিরে আসবে ; চাঁদ আবার ভ'রে উঠবে ;
সন্ধ্যার পর সন্ধ্যা নতুন, অপরূপ তার উন্মীলন :
কিন্তু আমরা জ্ব'লে যাই মোমবাতির মত,
প্রাণের আগুনের ইন্ধন আমাদের শরীর ;
আমরা জ্ব'লে যাই, নিবে যাই, নিঃশেষ হ'য়ে যাই,
কিছু থাকে না।

তাই এখন, সময় যখন আছে
আমি তোমাকে ডাকছি।
তোমাকে ডাকছি সময়ের সরু গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে,
তার দু'দিক মৃত্যুর দেয়াল দিয়ে ঠাসা। দেরি কোরো না তুমি
আর দেরি কোরো না। যত সময় আমরা নষ্ট করবো লজ্জায়
আর অভিমানে আর আত্ম-বঞ্চনায়
তার যোগ্যতা কি আছে মৃত্যুর ? এমন উপঢৌকন তাকে দেবো
মৃত্যু কি এত বড় বন্ধু আমাদের ?

গানের মধ্যে গান

বুদ্ধদেব বসু

অনেক গান আমি গাই
তোমরা তা শুনে খুসি হও :
ঘরে আলো জ্বলে, চারদিকে মুগ্ধ চোখের দৃষ্টি,
গান শেষ ক'রে রানির মত আমি চ'লে যাই
স্তুতির তোরণের তলা দিয়ে।

আমার সে-সব গান তোমাদের, সকলের ; তা আমার মুখের মত
যা সবাই দেখতে পায় ; তা অলঙ্কারের মত, যা আমাকে বাড়ায় ;
তা আমাকে বড় ক'রে তোলে, রানি ক'রে তোলে আমাকে—
আমাকে ঢেকে রাখে সেই সঙ্গে।

শিশু যেমন দু'হাতে জল নিয়ে ছড়ায়, তেমনি আমি ছড়িয়ে দিই সে-সব গান ;
ছড়িয়ে দিই, তারপর ভুলে যাই ; যেমন সুন্দরী তার অলঙ্কার ভুলে থাকে
উৎসবের সন্ধ্যার শেষে—
তার মুক্তো আর প্রবাল আর টলটলে হীরের সব আলো—
যা দেখতে তোমরা ভালোবাসো, সে নিজে চাপা পড়ে যার আড়ালে।

তাই মাঝ-রাতে সে যখন যায় তার স্বামীর কাছে
কেবল নিজেকে নিয়েই যায়
কেবল নিজেকে—
মুক্ত, নগ্ন, অপরূপ, অতুলনীয় সে নিজে।

আমারও একটি গান আছে
একটি গান,
যখন আলো নিবে যায় আর রাত বাড়ে, ঘরের মধ্যে আমি একা,
তখন গুন্‌গুন্ ক'রে তা গাইবো,
গুন্‌গুন্ ক'রে, নরম, ঘুমে-ভরা, স্বপ্নে-ভরা স্বরে,
অন্ধকার ভ'রে
সমস্ত রাত্রি ভ'রে—
আর সময় ব'য়ে যাবে সূক্ষ্ম অদৃশ্য স্রোতে, বিশ্বের বিদীর্ণ হৃৎপিণ্ড থেকে
ঝ'রে-পড়া রক্তবিন্দু,
আমার গালের উপর দিয়ে নেমে-আসা অশ্রুর মত।

সে-গান আমার একলার, সে-গান আমার নিজের জন্য
আমার নিজেকে নিজে শোনানো,
সে-গান আমার নিজের সঙ্গে আমার কথা
রাত্রির অন্ধকারে, চুপে-চুপে।

অনেক গান আমি গাই,
তোমরা সে-সব শোনো, শুনে ভালো বলো :
কিন্তু একটি গান আছে যা তোমরা এখনো শোনোনি, কখনো শুনবে না,
তা নিঃশব্দে উঠে আসে আমার নিভৃত অন্ধকারের উৎস থেকে
যেমন রাত্রির হৃদয় থেকে উৎসারিত তারার ঝরনা :
রাত যখন বাড়ে, চারদিকে সব চুপচাপ, তখন সেই গানের সময়।
তখন সেই স্তব্ধতার কলরোলে কোথায় ভেসে যায়
আমার সব গান, যা তোমরা শুনেছো।
ঢেউয়ের মত তা আমাকে তুলে ধরে, আছাড় মেরে ফেলে মূর্চ্ছার তটরেখায়,
মৃত্যুর সীমানায় :
বুক ভেঙে যায় আমার
আমি ম'রে যাই।

কার জন্য সে-গান ?
আমার সে-গান কাকে শোনাবো ?
যে চায় তারই জন্য ; যে চাইতে পারে
তারই জন্য।

তোমরা, আমার গান শুনে যারা খুসি হ'লে
সেই গান কেউ শুনতে চাইলে না।

একদিন, একজন
কোনো একজন আসবে
তারও অন্তরে সেই নিঃশব্দ স্বর-স্রোত
রাত্রির অন্ধকার থেকে নিঃসৃত :
রাত্রি তার বুকের মধ্যে, আর সেখানে
আমার গানের স্বর জোনাকির সারির মত।
সে যখন কাছে আসবে, আমার সমস্ত শরীর গানের একটা ঢেউ হ'য়ে উঠবে
ভেঙে পড়বে তার বুকের উপর,
ঝ'রে পড়বে, নিঃশব্দে, নিঃশেষে ঝ'রে পড়বে—
আচ্ছন্ন ক'রে
নিশ্চিহ্ন ক'রে
সমস্ত বিশাল রাত্রিকে বিচূর্ণ ক'রে
দুই আঙুলের মধ্যে চেপে-ধরা পাকা আঙুরের মত।

তুমি যখন চুল খুলে দাও

বুদ্ধদেব বসু

তুমি যখন চুল খুলে দাও
ভয়ে আমি কাঁপি।

তুমি যখন চুল খুলে দাও,
ভেসে আসে তোমার চুলের গন্ধ,
গুনগুন ক'রে গান করো তুমি,
ভয়ে আমার বুক কাঁপে।

গুনগুন ক'রে গান করো তুমি
আমার পাশে ব'সে :
তোমার মুখ দেখা যায় না,
বুকে এসে লাগে চুলের গন্ধ
ভয়ে আমার বুক কাঁপে।

তোমার মুখ ফেরানো ;
তোমার কালো চুল বেয়ে পড়ে,
তোমার কালো চুল বেয়ে ওঠে
আমার হৃদয় জড়িয়ে—
ভয়ে আমি মরি।

তুমি যখন চুল খুলে দাও
ভয়ে আমি কাঁপি।

নগ্ন নির্জ্জন হাত

জীবনানন্দ দাশ

আবার আকাশে অন্ধকার ঘন হ'য়ে উঠছে :
আলোর রহস্যময়ী সহোদরার মত
এই অন্ধকার।

যে আমাকে চিরদিন ভালোবেসেছে,
অথচ যার মুখ আমি কোনোদিন দেখিনি,
সেই নারীর মত
ফাল্গুন আকাশে অন্ধকার নিবিড় হ'য়ে উঠছে।

মনে হয় কোন বিলুপ্ত নগরীর কথা
সেই নগরীর এক ধূসর প্রাসাদের রূপ জাগে হৃদয়ে।

ভারত-সমুদ্রের তীরে
কিংবা ভূমধ্যসাগরের কিনারে
অথবা টায়ার সিন্ধুর পারে
আজ নেই, কোনো এক নগরী ছিল একদিন,
কোন্ এক প্রাসাদ ছিল ;

মূল্যবান আসবাবে ভরা এক প্রাসাদ :
পারস্য গালিচা, কাশ্মীরী শাল, বেরিন্ তরঙ্গের নিটোল মুক্তাপ্রবাল,
আমার বিলুপ্ত হৃদয়, আমার মৃত চোখ, আমার বিলীন স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষা,
আর তুমি নারী—
এইসব ছিল সেই জগতে একদিন।

অনেক কম্‌লা রঙের রোদ ছিল,
অনেক কাকাতুয়া পায়রা ছিল,
মেহগনির ছায়াঘন পল্লব ছিল অনেক ;

অনেক কম্‌লারঙের রোদ ছিল,
অনেক কম্‌লারঙের রোদ ;

আর তুমি ছিলে ;
তোমার মুখের রূপ কত শত শতাব্দী আমি দেখিনা,
খুঁজিনা।

ফাল্গুনের অন্ধকার নিয়ে আসে সেই সমুদ্রপারের কাহিনী,
অপরূপ খিলান ও গম্বুজের বেদনাময় রেখা,

লুপ্ত নাস্‌পাতির গন্ধ,
অজস্র হরিণ ও সিংহের ছালের ধূসর পাণ্ডুলিপি,
রামধনু রঙের কাচের জানালা,
ময়ূরের পেখমের মত রঙীন পর্দ্দায় পর্দ্দায়
কক্ষ ও কক্ষান্তর থেকে আরো দূর কক্ষ ও কক্ষান্তরের
ক্ষণিক আভাস,—
আয়ুহীন স্তব্ধতা ও বিস্ময় !

পর্দ্দায়, গালিচায় রক্তাভ রৌদ্রের বিচ্ছুরিত স্বেদ,
রক্তিম গেলাসে তরমুজ মদ :
তোমার নগ্ন নির্জ্জন হাত ;

তোমার নগ্ন নির্জ্জন হাত।

শিকার

জীবনানন্দ দাশ

ভোর—
আকাশের রং ঘাসফড়িঙের দেহের মত কোমল-নীল ;
চারিদিকে পেয়ারা ও নোনার গাছ টিয়ার পালকের মত সবুজ।
একটি তারা এখনও আকাশে র'য়েছে :
পাড়াগাঁর বাসরঘরে সব চেয়ে গোধূলি-মদির মেয়েটির মত ;
কিংবা মিশরের মানুষী তার বুকের থেকে যে মুক্তা আমার নীল মদের
গেলাসে রেখেছিল
হাজার হাজার বছর আগে একরাতে—তেম্নি—
তেম্নি একটি তারা আকাশে জ্বলছে এখনও।

হিমের রাতে শরীর 'উম্' রাখবার জন্য দেশোয়ালীরা সারারাত মাঠে
আগুন জেলেছে,—
মোরগফুলের মত লাল আগুন ;
শুকনো অশ্বত্থপাতা দুমড়ে এখনও আগুন জ্বলছে তাদের ;

সূর্য্যের আলোয় তার রং কুঙ্কুমের মত নেই আর ;
হ'য়ে গেছে রোগা শালিখের হৃদয়ের বিবর্ণ ইচ্ছার মত।
সকালের আলোয় টল্‌মল্ শিশিরে চারিদিকের বন ও আকাশ ময়ূরের
সবুজনীল ডানার মত ঝিল্‌মিল্ করছে।

ভোর ;
সারারাত চিতাবাঘিনীর হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে
নক্ষত্রহীন, মেহগনির মত অন্ধকারে সুন্দরীর বন থেকে অর্জ্জুনের বনে
ঘুরে ঘুরে
সুন্দর বাদামী হরিণ এই ভোরের জন্য অপেক্ষা ক'রছিল।

এসেছে সে ভোরের আলোয় নেমে ;
কচি বাতাবীলেবুর মত সবুজ সুগন্ধি ঘাস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে ;
নদীর তীক্ষ্ণ শীতল ঢেউয়ে সে নামল—
ঘুমহীন ক্লান্ত বিহ্বল শরীরটাকে স্রোতের মত একটা আবেগ দেওয়ার
জন্য
অন্ধকারের হিম কুঞ্চিত জরায়ু ছিঁড়ে ভোরের রৌদ্রের মত একটা বিস্তীর্ণ
উল্লাস পাবার জন্য ;
এই নীল আকাশের নীচে সূর্য্যের সোনার বর্শার মত জেগে উঠে
সাহসে সাধে সৌন্দর্য্যে হরিণীর পর হরিণীকে চমক লাগিয়ে দেবার জন্য।

একটা অদ্ভুত শব্দ।
নদীর জল মচ্‌কাফুলের পাপড়ির মত লাল।
আগুন জ্বল্‌ল আবার,—উষ্ণ লাল হরিণের মাংস তৈরি হ'য়ে এল।
নক্ষত্রের নীচে ঘাসের বিছানায় ব'সে অনেক পুরানো শিশিরভেজা গল্প;
সিগারেটের ধোঁয়া;
টেরিকাটা কয়েকটা মানুষের মাথা;
এলোমেলো কয়েকটা বন্দুক,—হিম—নিঃস্পন্দ নিরপরাধ ঘুম।

'বলিল অশ্বত্থ সেই'

জীবনানন্দ দাশ

বলিল অশ্বত্থ ধীরে: কোন্ দিকে যাবে বল—তোমরা কোথায় যেতে চাও?
এতদিন পাশাপাশি ছিলে আহা, ছিলে কত কাছে;
ম্লান খোড়ো ঘরগুলো আজো তো দাঁড়ায়ে তারা আছে;
এই সব গৃহ মাঠ ছেড়ে দিয়ে কোন্ দিকে কোন্ পথে ফের
তোমরা যেতেছ চ'লে পাইনাক' টের!
বোঁচকা বেঁধেছ ঢের,—ভোল নাই ভাঙা বাটি ফুটা ঘটিটাও;
আবার কোথায় যেতে চাও?

পঞ্চাশ বছরও হায় হয়নিক',—এই তো সেদিন
তোমাদের পিতামহ, বাবা, খুড়ো, জেঠামহাশয়
আজো আহা, তাহাদের কথা মনে হয়!—
এখানে মাঠের পারে জমি কিনে খোড়ো ঘর তুলে
এই দেশে এই পথে এই সব ঘাস ধান নিম জামরুলে
জীবনের ক্লান্তি ক্ষুধা আকাঙ্ক্ষার বেদনার শুধেছিল ঋণ;
দাঁড়ায়ে দাঁড়ায়ে সব দেখেছি যে,—মনে হয় যেন সেই দিন!

এখানে তোমরা তবু থাকিবে না যাবে চ'লে তবে কোন্ পথে ?
সেই পথে আরো শান্তি—আরো বুঝি সাধ ?
আরো বুঝি জীবনের গভীর আস্বাদ ?
তোমরা সেখানে গিয়ে তাই বুঝি বেঁধে রবে আকাঙ্ক্ষার ঘর !...
যেখানেই যাও চ'লে হয় নাক' জীবনের কোনো রূপান্তর ;
এক ক্ষুধা এক স্বপ্ন এক ব্যথা বিচ্ছেদের কাহিনী ধূসর
ম্লান চুলে দেখা দেবে যেখানেই বাঁধ গিয়ে আকাঙ্ক্ষার ঘর !
বলিল অশ্বত্থ সেই ন'ড়ে ন'ড়ে অন্ধকারে মাথার উপর।

নদী

জীবনানন্দ দাশ

বঁইচির ঝোপ শুধু—শাইবাবলার ঝাড়—আর জাম হিজলের বন,—
কোথাও অর্জ্জুন গাছ—তাহার সমস্ত ছায়া এদের নিকটে টেনে নিয়ে
কোন্ কথা সারাদিন কহিতেছে অই নদী ?—এ নদী কে ?—ইহার জীবন

হৃদয়ে চমক আনে ;—যেখানে মানুষ নাই—নদী শুধু—সেইখানে গিয়ে
শব্দ শুনি তাই আমি,—আমি শুনি—দুপুরের জলপিপি শুনেছে এমন
এই শব্দ কত দিন ;—আমিও শুনেছি ঢের বটের পাতার পথ দিয়ে

হেঁটে যেতে—ব্যথা পেয়ে ; দুপুরে জলের গন্ধে একবার স্তব্ধ হয় মন ;
মনে হয় কোন্ শিশু ম'রে গেছে,—আমারি হৃদয় যেন ছিল শিশু সেই ;
আলো আর আকাশের থেকে নদী যতখানি আশা করে—আমিও তেমন

একদিন করিনি কি ? শুধু একদিন তবু ? কারা এসে ব'লে গেল, 'নেই—
গাছ নেই—রোদ নেই—মেঘ নেই—তারা নেই—আকাশ তোমার তরে নয় !'—
হাজার বছর ধ'রে নদী তবু পায় কেন এই সব ? শিশুর প্রাণেই

নদী কেন বেঁচে থাকে ?—একদিন এই নদী শব্দ ক'রে হৃদয়ে বিস্ময়
আনিতে পারে না আর ;—মানুষের মন থেকে নদীরা হারায়,—শেষ হয়।

হাজার বছর শুধু খেলা করে

জীবনানন্দ দাশ

হাজার বছর শুধু খেলা করে অন্ধকারে জোনাকীর মত :
চারিদিকে পিরামিড্,—কাফনের ঘ্রাণ ;
বালির উপরে জ্যোৎস্না,—খেজুর-ছায়ারা ইতস্তত
বিচূর্ণ থামের মত : এশিরিয় ;—দাঁড়ায়ে র'য়েছে মৃত, ম্লান।
শরীরে মমির ঘ্রাণ আমাদের,—ঘুচে গেছে জীবনের সব লেন্‌দেন্ ;
'মনে আছে ?' সুধাল সে—সুধালাম আমি শুধু, 'বনলতা সেন ?'

অগ্নিবর্ণ

সমর সেন

রাত্রির দিগন্তে ঘুরে ফেরে
আদিম জন্তুর মতো বিরাট মেঘ ;
সে মেঘে পাহাড় আর আকাশ হলো ধূসর গম্ভীর,
আর এতোদিন পরে আজ মৃত্যু কি এলো,
হে অগ্নিবর্ণ !
নির্জন গুহায় নিবিড়, নিষিদ্ধ প্রেম,
ভিজে ফুলের মতো নর্তকীর নরম শরীর,
প্রতীক্ষায় কম্পমান কতো স্ফীত উজ্জ্বল বুক,
তবু আজ মৃত্যু এলো আষাঢ়ের মেঘের মতো,
হে অগ্নিবর্ণ !

বসন্ত

সমর সেন

পাইন বনে মর্মর ধ্বনি,
এখনি সন্ধ্যা নামবে দিগন্তে
লাল মেঘের বন্যায় ;
তারপর রাত্রি ভ'রে ট্র্যাফিক পুলিশের নিঃসঙ্গতা,
আর রাত্রির অরণ্যে
কতো পুরোনো স্মৃতির তীক্ষ্ণ সাপ।
আমাদের রক্তে আজ
কতো পুরোনো স্মৃতির বিষাক্ত সাপ,
বিগত কতো বসন্তের উপবাসী
বিশাল অজগর ;
আর আমাদের উপরে আজ উজ্জ্বল অপরূপ আকাশ,
সামনে লাল পাথরের স্নিগ্ধ পথ,
দূরে মেঘের ছায়া পড়ল সবুজ, গম্ভীর পাহাড়ে।

আমার এ রাত ত ভ্রমর

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মৈত্র

১

আমার এ রাত ত ভ্রমর।
বৃন্ত্যচ্যুত অন্ধকার
মধুগর্ভ হল তার
কামনার ডাকে।
দুষ্প্রেক্ষ্য চোখের আলো নিবাও ভ্রমর।
তারাদের বিন্দু বিন্দু প্রশ্নের আভাস
ভরেছে আকাশ।
জীবনের সৌরক্ষণগুলি,
কী দুষ্প্রেক্ষ্য চোখ !
তোমার ও গুঞ্জনের ধূলি
ঢাকুক তাদের
মেঘাক্রান্ত কৃষ্ণপক্ষ নিভাক সে লোক।

২

অনুবীক্ষণই যদি
মেলে দাও চোখে,
অতীতের ক্ষীণ প্রান্ত
যদি দেয় ধরা
নিষ্পত্র শীতের যুগে
পাতার কঙ্কাল হবে সাথী।
তবু এ ভ্রান্তির পরিণয়
ফোটাবে কি ফুল—
ধরাবে কি ফল ?
জীবনের পশ্চিমে প্রদোষ
উড়াবে ক্লান্তির ধূলি
ছায়া হবে দীর্ঘতর
জন্মলোক পানে।

৩

পশ্চিমের রৌদ্রচূর্ণে
ছিন্ন ভিন্ন রাতের সাগর,
প্রজ্ঞা-শিখরে নামে ক্রোধ।

বয়স্ক মানুষ মরে স্মরণের চাপে
ক্ষুধার্ত্ত সে স্মরণ-শ্বাপদ।
উর্দ্ধমূল প্রকৃতির অসংখ্য শিকড়
আকাশের করে শ্বাসরোধ।
তবু আসে রৌদ্রচূর্ণ-সোনালী বিকাল
আর আসে স্বপ্নকুন্ড-প্রলাপী নায়ক।
আছে দেরী কত দিন—
আর দেরী কত দূর প্রয়াণের বৈতরণী তীর ?
নাস্তিকের স্বীকৃতির ফাঁক আজো নীল
নৃসিংহ-নখর বহুদূরে।

আত্ম-ইতিহাস

মোহিত দাশগুপ্ত

আমার ভাবনা-রশ্মি
তাকে স্পর্শ করচে—
প্রতি মুহূর্ত্তে
আমার মন থেকে যে-ভাবনা স্রোত ছুটে চলেচে
দিকে দিকে,
সময় ও স্থানের শূন্যতাকে
উল্লঙ্ঘন ক'রে,
আর বহু জিনিষ ও ঘটনার সঙ্গে
চিন্তার অসংখ্য সূত্রে
আমাকে যুক্ত করচে,
তারই মাঝে ওর অস্তিত্ব
নিবিড়ভাবে
আমাকে স্পর্শ করে।

বেহালার তার থেকে সুরের ফুল্‌কী ক্ষণে ক্ষণে
যেমন চারিপাশে আকাশে ওড়ে
আর ঝলমল করে
তেমনি ভাবনার গ্রন্থিগুলো
হঠাৎ কেমন কাঁপতে থাকে ;
আর
তা থেকে ছিট্‌কে পড়ে
অতীতের মুহূর্ত্তগুলো,
মুক্তি পায় আমাদের আত্মার প্রেতদল
বিস্মৃতির বন্ধন থেকে ;
ক্ষণিকের আলোকসম্পাতে পাঠ করি—
অতীতের অন্ধকারে প্রচ্ছন্ন
আত্ম-ইতিহাস।

বহুযুগ আগের অ্যানুথ্রপয়েড্‌ থেকে
আধুনিক মানুষের মাঝেকার
অসংখ্য জীব-স্তরে
যে-ভাবনা আমাদের ব্যর্থ হ'ল,

যে-আনন্দ
অসহ্য অনুভূতিতে স্পন্দিত হয়েছিল
চাঁদের মত
বুদ্ধির বহু উর্দ্ধে,
যে-রহস্য আমাদের মনকে
উদ্বেলিত করেছে
বেদনায় ও বিস্ময়ে—
কালের সীমাহীন আকাশে
হঠাৎ দেখতে পাই
তাদের সমারোহ চলেচে
আমাদের সত্তাকে বেষ্টন ক'রে।
আমার ভাবনায়-ভাবনায়
তাদের প্রতিচ্ছবি ভেসে ওঠে—
এক মুহূর্ত্ত :
তারপর কোথায় সব অদৃশ্য, নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেল,
অজ্ঞতা ও অবোধ্যতা
ঘিরে ফেলে আমায়।

আবার
শুধু নির্ব্বাক বেদনায়
বুঝতে পারি
তারই সঙ্গে আমি বাঁধা,
যুগ-যুগ থেকে :
কিন্তু কোথায় সে বন্ধন-রজ্জু
যা ধ'রে আমরা
দু'জনা দু'জনার
কাছে এগিয়ে যেতে পারি ?

অন্ধকারের যোজন-ব্যাপী শিকল ঝুলচে আমাদের মাঝে।

শত্রু

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

সে বছরের সেরা ছাত্র মহীতোষ রায়
শত্রু হ'লো সেদিন থেকে :
আমার শোভনাকে ছিনিয়ে নেবার দিন।
ছাদে কাটতো গরমের সন্ধ্যা, আর
পড়ার ঘরে বর্ষার বেলা,
তখন মহীতোষ তো ছিলো বন্ধুমাত্র।

আমাকে আর শান্তি দেবে না মহীতোষ :
বিদেশে আছি, তার মারা যাবার
কী দরকার ছিলো? আমার নিশ্বাস তার
ক্ষতি করেনি তো কোনো।

হঠাৎ ব্যথা অনুভব ক'রলুম বুকে—
শীতের দেশে বরফের রাস্তা দিয়ে
হেঁটে যাওয়ার মতো :

এতোদিন শত্রু ছিলো শুধু মহীতোষ
এখন শোভনাও তো।

দৃষ্টান্ত

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

দেয়ালের কোটরে
আমার টেবিলের মাথার উপর
কয়েকটা চড়ুই বেঁধেছে বাসা।
কাজ করা অসম্ভব :
তাদের শীর্ণ কিচকিচ শব্দ
ভালো লাগে, অথচ ভালো নয়।

সুবর্ণ আমার অবস্থা বোঝে নাকি?
ভেঙে দিতে চায়
পাখীদের বাসাটা ;
হাতে ধ'রে আস্তে বাধা দিই তাকে,
এরা তো আমাদের দৃষ্টান্ত।

বাতায়ন

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

মৃতকল্প প্রবঞ্চক বকধর্ম্মে সহসা বিরূপ,
আতুরালয়ের যত্নে আজি তার বিবমিষা জাগে ;
ভিত্তিপাল বিগ্রহের নিরাগ্রহ, অনির্ব্বাণ ধূপ
বিমুখ করেছে তারে, অন্তরাত্মা ভরেছে বিরাগে ॥

ক্ষীয়মাণ অস্থি-মজ্জা, ম্রিয়মাণ মেদ-মাংস বহি
স্বর্ণপ্রভ জানালায় কায়ক্লেশে সে এসে দাঁড়ায়,
কাচের কবাটে যেথা বাধা পেয়ে সবিতা বিরহী
প্রস্তরিত রাজপথে পদচিহ্ন এঁকে চ'লে যায় ॥

গৃধ্নু নীলাকাশসম জরদগ্ধ ওষ্ঠাধরে তাই
ক্লেদের কলঙ্ক লেপে স্ফটিকের রুদ্ধ বাতায়নে,
সে ভাবে কুমারী প্রিয়া আজো বুঝি তারে ভুলে নাই,
সে-প্রাক্তন মধুকোষ মুঞ্জরিবে তাহারি চুম্বনে ॥

মদাবিল মন তার ভবিতব্য অমনি পাশরে—
অস্বাস্থ্য, অশক্ত আর্ত্তি, কালক্ষেপ, আরতির ঘৃত।
দেখে সে উধাও চোখে নগরের রঞ্জিত শিখরে
ছিন্নকণ্ঠ সায়াহ্নের রক্তস্রোত ছুটে অবারিত ॥

চাহে সে দিগন্ততটে, সুরভির নীলারুণ নদে
সোনার ময়ূরপঙ্খী সুপ্ত যেথা রাজহংসসম।
উর্ম্মিল বেপথু লাগে মাঝে মাঝে সে-বক্র সম্পদে ;
স্মৃতির প্রসাদ পেয়ে অবসাদ হয় নিরুপম ॥

আমিও তেমনিতর জুগুপ্সায় সংসার-বিবাগী
সুখের নিষ্প্রাণ পঙ্কে ক্ষুন্নিবৃত্তি করি না সন্ধান।
স্তন্যজীবী সন্তানের অন্নজীবী জননীর লাগি
সে-মলার সঞ্চয়নে আমি আর নহি সাবধান ॥

আমিও পলায়ে বাঁচি ; সেইমতো জীবনবিমুখ
আমিও তাকায়ে থাকি নির্নিমেষে কাচের কবাটে ;
সুবর্ণ শিশিরসিক্ত উষসীর অমলিন মুখ
আমাকেও ডাক দেয় অসীমের অর্গলিত বাটে ॥

৩

সে-মায়ামুকুরে আমি ইচ্ছামৃত্যু, স্বয়ম্ভূ দেবতা,
রূপদক্ষ বিশ্বকর্ম্মা, অরূপের সহজ সাধক ;
নিষিদ্ধ স্বর্গের কুঞ্জে প্রস্ফুটিত মোর কল্পলতা ;
অধ্যাত্ম্যের অভিষেকে আমি সেথা সর্ব্বসম্পাদক ॥

কিন্তু মোহ মুহূর্ত্তের ! মর্ত্যই বিজয়ী হয় শেষে :
এ-নিশ্চিন্ত আশ্রয়েও পশে আসি সংক্রমণ তার,
অন্তরে বিতৃষ্ণা জাগে, নীলিমার শুদ্ধ নিরুদ্দেশে
পুঞ্জ হয় সংসারের পাশবিক দুর্গন্ধ উদ্গার ॥

হায় রে সন্তপ্ত আত্মা, উদ্ধারের এই কি উপায়—
পিশাচের অসম্ভ্রমে দৈবী মায়া অন্ধ রোষে হানা,
কালের অগাধ রন্ধ্রে ঝুলে থাকা ত্রিশঙ্কুর প্রায়,
শূন্যে উদ্ভাবন করা বিস্তারিয়া পর্ণহীন ডানা ?

(Stéphane Mallarmé-র Les Fenêtres কবিতার অনুবাদ)

প্রার্থনা

বিষ্ণু দে

পাখীর আবেগ জাগাবে শরীর মনে ?
পাখার ঝাপট দিনরাত যাব শুনে ?
পাখার ছন্দ হৃদয়েরে দেবে বেঁধে
হর্ষবিহারে দূরদিগন্তকোণে ?

নগরের ভিড়, ব্যর্থ দিনের জ্বালা !
অসহায় ভীরু ? শুধু তার পথে চলা ?
বন্ধুর ভ্রূ-ও কুটিল—ঋণের ভীতি ?
অগণন লোক—তবু জ্বলা, শুধু জ্বলা !

গ্রন্থলোকের পরিক্রমা তো শেষ !
শিল্পীজনের মিতালিতে দিই শিষ্ !
নিঃসঙ্গতা মুখোমুখি অপলক !
দুপাশে ঘনায় ক্লান্তির মেঘাবেশ ।

দিশাহারা চোখ, চরণ শ্রান্তিহীন—
স্থিতি চাই নে কো,
ঘুঘু নয় ওগো শ্যেন !

উর্দ্ধলোকের উদ্ধতগতি দাও
তুষারতুঙ্গ চূড়ায় চূড়ায় ঘোরা
স্বচ্ছশীতল হাল্‌কা হাওয়ায় ঘোরা!
কাটুক্‌ আমার জীবনমরণে সেতুবন্ধনী দিন।

হে মেরুচারিণী তোমার চোখের নীল
ইস্পাতে আজ ঝলসি' উঠুক্‌
কঠিন দীর্ঘ খড়্গোদ্যত দিন
উর্দ্ধলোকের উদ্ধতগতি চরণ শ্রান্তিহীন।

ইণ্টের ক্লাস

যুবনাশ্ব

ছাড়লো গাড়ী জসিডি ষ্টেশন থেকে।
বাক্স, বোঁচকা, প্রসাদ ও পেঁড়ার পুটলী,
ও 'পাসে'র যাত্রী সপরিবার মালবাবু, তারবাবু
ও টালিবাবুর বে-পরোয়া গার্হস্থ্য-বিস্তার অতিক্রম ক'রে
কোনোমতে ঠাঁই নিলেম দুজনে,
ইণ্টের ক্লাসের অপরিসর অভ্যন্তরে।

লাল কস্তাপাড়ের হাফ-ঘোমটা সরিয়ে
মাল-বৌদি উত্যক্ত বিরক্তিতে গুঁজলেন গালে
দোক্তা-পানের খিলি।
টালি-বৌঠান,
ঝালরদার বালিশের তৈলাক্ত আলিঙ্গন-লিপ্ত
নবম ও কনিষ্ঠ সন্তানের নগ্ন গাত্রে
দিলেন টেনে কাঁথার কোণা।
তারবাবু হঠাৎ উঠে প্রাণান্ত কাসির বেগ রোধ ক'রে,
ঠুকলেন দেশালাই আধপোড়া বিড়ির প্রান্তে।

মুখ চাওয়া-চাওয়ি ক'রে
তুমি বসলে বেঞ্চির একধারে,
আমি মেঝেয়।
সন্ধ্যা তখন গড়িয়ে যায়।
সন্ধ্যা তখন গড়িয়ে যায়
মহুয়া বনের পার দিয়ে,
ফুটন্ত পলাশরাগে আগুন-লাগা দিগন্ত বেয়ে।
জানালা দিয়ে চোখে পড়ে
চষা, রুক্ষ ক্ষেতের গোলকধাঁধাঁ,
আর পলায়মান পাহাড়ের সার,—
আসন্ন অন্ধকারের আবির্ভাবে ভীত।

অচঞ্চল আকাশের নরম নীল
গাঢ়তর হ'য়ে ওঠে রাত্রির অঞ্চল-সঞ্চালনে।
হাজারো তারার মিছিল চলে সার বেঁধে মাথার ওপর,
ভেতরে চলে রেলবাবুদের অব্যাহত শান্তিপর্ব্ব,
ঘূর্ণ্যমান ভূলোক চলে সাথে-সাথে
সগর্জ্জনে ছুটে চলে রেলগাড়ী।

ধীরে, তোমার মাথা ঢ'লে পড়ে জানালার কাচে ;
ঘুমের কুহক আনত বিষণ্ণ মুখে আনে স্বপ্নের সম্মোহ।
প্রশ্বাস-স্ফীত নাসাগ্রে
অর্দ্ধস্ফুট ওষ্ঠ-প্রান্তে
ক্লান্ত চোখের কোল বেয়ে জাগে অতৃপ্তির রেখা।
সে কি আত্মবঞ্চনার ?
তোমার মগ্নমানসে জাগে কিসের কোলাহল ?
তুমি শিউরে ওঠো !

আমার বুকের দুরুদুরুতে
জাগে
দুঃসহ দুরন্ত দুরাশার দুঃস্বপ্ন।
প্রতি পেশীতে প্রাকৃত পাশব প্ররোচন।
ধমনীতে জ্বলে তপ্ত রক্তের প্রদাহ।

জাগে মহাকাল,
যেমন জেগেছিল অহল্যাসক্ত বাসবের
বিলাস-বিভ্রমের মুহূর্ত্তে।

আর জাগে
নিদ্রিত তারবাবুর স্ফটিকনির্ম্মিত নকল চোখটি
বীভৎস কপট কৌতূহলে।

একটি কথা

যুবনাশ্ব

কতোদিন গিয়েচি তোমার কাছে
একটি কথা বল্‌ব ব'লে।
কথার ওপর কথা গেঁথে
কতো হাজার কথা ব'লে এলাম,
কিন্তু সেই একটি কথা বলা হোলো না।
কথার বনে হারিয়ে গেলো আমার প্রাণের কথা,
খুঁজে-খুঁজে খেইহারা পাগলের মতো ঘোরা
আজো শেষ হয়নি।
দিনের দাবদাহ
নিভে গেল কতো সন্ধ্যার শোণিতাঞ্জলিতে।
জবাকুসুমসঙ্কাশের
প্রাত্যহিক প্রকাশে পরিসমাপ্ত হোলো
কতো রাত্রির প্রেতোৎসব।
সৌরচক্রচারী কতো লক্ষ গ্রহনক্ষত্রের
কক্ষচ্যুত বিশৃঙ্খলা
নিঃশেষ হোলো আত্মঘাতী উল্কাপাতে।
কতো প্রাণস্পন্দ পরুষ পাষাণে পর্য্যবসিত হোলো চন্দ্রলোকে।

বসুন্ধরাকে বেষ্টন ক'রে ঝঞ্ঝালাঞ্ছিত অম্বুধি
আছড়ে পড়লো শতধা আকুতিতে,—
মেঘমৌলী মৌনী হিমাদ্রির সমাধিসর্ব্বস্ব মগ্ন-মানস
রইলো নির্ব্বিকল্প, নির্ব্বিকার।
অব্যক্তের অব্যয় আবাসে
কথা আমার আজো রইলো অনুচ্চারিত।
কথার ওপর কথা গাঁথা
তাই আজো শেষ হোলো না।

বিস্ময়

দ্বিজেন্দ্র মৈত্র

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এল বন্যার স্রোতের মতো,
উড়ে এলো নিঃশব্দে বাদুড়ের পাখা-সঞ্চালনের মতো,
ধূসর আকাশে ধীরে ধীরে ফুটে উঠ্‌চে তারা
যেন আঁধার নদীতে যাত্রীবাহী নৌকার আলোর শিখা।
করবীর ঝাড় থেকে বাতাস আসে কেঁপে-কেঁপে
ভীরু রজনীগন্ধার মৃদুগন্ধ জড়িয়ে আছে রাতের অন্ধকারে।

শুধু তুমি আর আমি, আছি পাশাপাশি এই আকাশের তলে
চাঁদ এখনো ওঠেনি, পূব আকাশে তার হলুদ রঙের আভা।
আমরা বেঁচে আছি, রয়েছি পাশাপাশি
তোমার চোখে দেখি ভোরের স্বপ্ন আঁকা।
আমরা আছি, এর চেয়ে আনন্দময় বিস্ময় আর কী হতে পারে?
এ রহস্যের কূলসীমা নেই, ভাষাহীন অনির্ব্বচনীয়।

কবিতা

স্মৃতিশেখর উপাধ্যায়

দুনিয়ায় কত রকমেরই পাগল থাকে।
এলুম নতুন ভাড়াটে বাড়ীতে :
প্রতিবেশী একজন অবসর-প্রাপ্ত হাকিম।
তাঁর বাড়ীর ছাদ আমার ছাদেরই পাশে,
মাঝে সরু একটা গলি।

বুড়োর পাকা দাড়ি,
হাসি হাসি মুখ, সুস্থ সবল শরীর।
বিকেলবেলা দেখি ছাদে দাঁড়িয়ে ঘুড়ি উড়োচ্চে!
আমার চক্ষু ত ছানাবড়া,—বিস্ময়ে।

শুনলুম ভদ্রলোকটি বিপত্নীক বহুবৎসর।
রোজ ঘুড়িতে কত কি ছাইভস্ম লিখে আকাশে উড়োন।
নাটাই-এর সুতো যখন ফুরোয়
সুতার প্রান্তভাগটি হাতে নিয়ে ঘুড়িটা অনেকক্ষণ খেলান।

নভচর কখনও স্থির হয়ে থাকে,
কখনো বা একটা দীর্ঘ বৃত্তপথে ঘোরে।
ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার যখন ঘনিয়ে আসে
সেই রঙিন্ পেড়ে ঘয়লা ঘুড়ি,
ওরফে গগনবিহারী লিপিখণ্ড,
ধীরে ধীরে যখন শূন্যে মিশে যায়,
তখন তিনি সুতোটা দেন ছেড়ে।
ঢাউসটা কোথায় উধাও হয়,
বোধ করি কোনো অচিন নক্ষত্রলোকে।

প্রত্যহই তাঁর এই খেলা।
লোকটির আর কোনো উপদ্রবের বালাই নাই।
অনেক রকম পাগ্লামি দেখেছি, গল্পেও শুনেছি।
কিন্তু এই অশ্রুতপূর্ব্ব বাতুলতার নর্ম্মলীলা
দেখ্লাম অবাক্ হয়ে স্বচক্ষে।

পাড়ার লোকে বল্লে, ঘুড়িতে তিনি লেখেন কবিতা,
বিদেহিনী প্রেয়সীর উদ্দেশে।
ভোঁ-মারা ঘুড়ির লক যখন লুটিয়ে ভেসে যায়
অন্যান্য বাড়ীর গায়ের উপর দিয়ে,
তখন পাড়ার ছোঁড়ারা সেই উড়ুক্কু খণ্ডকাব্যের টুক্রাটিকে
টেনে নামিয়েছে তার নিরুদ্দেশ যাত্রাপথ থেকে।
বেনামিতে মাসিকপত্রে ছাপিয়েছে,
অপিচ, দিব্যি লাল পেন্সিলের দাগা দিয়ে
তাঁর কাছে বিনা মাশুলে ডাকে পাঠিয়েছে,
মায়, প্রত্যুত্তর সহ।

বৃত্তান্ত শুনে আমি হেসে ওদের বল্লুম,
অন্যান্য কবিদের সঙ্গে বেচারির পার্থক্য কেবল
প্রণয়-নিবেদনের উড্ডীয়মান পদ্ধতিতে।
যাদের ভাবো নিরুন্মাদ,
তারা নিজের নাম সই ক'রে
মাসিক পাক্ষিকে পাঠায় ছন্দোবদ্ধ উন্মাদনা,
কিম্বা গাঁঠের পয়সা খরচ ক'রে ছাপায়
শিশি-বোতল বিক্রিওয়ালার বস্তার খোরাক।

গান

স্মৃতিশেখর উপাধ্যা

তোমার মুখে সেদিন একটা পুরানো গান শুন্‌লাম।
অনেকের মুখেই শুনেছি সে গান।
ভালমন্দ গলায় তার নানান মূর্ত্তি দেখেছি।
সেদিন তার অভিনব রূপ ফুট্‌ল তোমার কণ্ঠস্বরে।

মেয়েদের বিয়ে হ'লে পৈত্রিক পদবী বদ্‌লে যায়,
তারা পায় স্বামীর গোত্র নাম।
গানগুলিও বুঝি স্ত্রীজাতীয়
তাদের রচয়িতার পরিচয় চাপা পড়ে
গায়কের স্বরাভিধায়।

হুঁকোর নল্‌চে মালা কল্‌কে বদ্‌লে গেল
সুরের ধূম্রজালে।
মনে হ'ল কথাগুলো বোবা,
তাদের বাণী ফুট্‌ল তোমার অনুপ্রাণনায়।
এক বোঁটায় এত ফুলও ফোটে
ইন্দ্রজালিকার ভেল্‌কিতে!

হায় গায়িকা!
কথাগুলো যে মরা বোড়ে,
তোমার চালে তারা হল নর্ম্মকুশলী।
তারিফ্‌ কর্‌লুম বটে,
কিন্তু কেমন করে অপরকে বোঝাই
কী আছে তোমার গানে।
কি ক'রে প্রত্যক্ষ করাব সেই ইন্দ্রজাল
যা শুধু একান্ত তোমার।

পশ্চিমের পাহাড়ে নদী,
ঝির্‌ঝির্‌ কর্‌ছে তার ক্ষীণ জলধারা,
ধু ধু করছে বালি আর বড় বড় পাথরের টুক্‌রো।
একবার দেখো তাকে নববর্ষার উন্মাদনায়!
তোমার গান সেই ফেনোচ্ছল মুক্তধারা,
তরঙ্গে তরঙ্গে কবরিত কথার বালুকা বিথার,
পাথরে পাথরে উদ্বেলিত সংঘাতমর্ম্মর।
এই তো গান!
প্রাণবন্যা ছুটে যায় উপলে-উপলে নূপুর বাজিয়ে।

নতুন কবিতা

পত্রপুট—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী, একটাকা।

রবীন্দ্রনাথের সাম্প্রতিক কাব্য ক্রমশই যেন তত্ত্বে ও জ্ঞানে গম্ভীর হ'য়ে আসছে। 'পুনশ্চ'র গদ্য কবিতাগুলোয় ছিলো লিরিকের অজস্র লীলা; 'পরিশেষে'র নাটকীয় কবিতাগুলোয় ছিলো মানুষের মনের উপর বিদ্যুৎ-তীক্ষ্ণ কটাক্ষপাত। এবং উভয় গ্রন্থেরই রচনাভঙ্গির ঝোঁকটা ছিলো সরলতার দিকে। 'পরিশেষে'র পদ্য একেবারে গদ্যের ছাঁচে ঢালা; 'পুনশ্চ'র ভূমিকায় গদ্য ছন্দ সম্বন্ধে যে দু'একটি নিয়ম তিনি উল্লেখ করেছিলেন, পদ্যের উপরে তা প্রয়োগ করলে কেমন হয় সেই পরীক্ষাই তিনি করেছিলেন 'পরিশেষে'। তার ফলে বাঙলা পদ্যের নতুন একটি ছাঁচ আমরা পেয়েছি, তা আরো বিচিত্র ব্যবহারের প্রতীক্ষা করছে।

'শেষ সপ্তকে'রই রচনাগুলো তত্ত্বমুখী, কবির গভীর ও জটিল চিন্তা-প্রসূত। 'বীথিকা'তেও লক্ষ্য করেছি, যে-কবিতাগুলো নেহাৎই হালকা নয়, তাদের ঝোঁকটা ঐ দিকে। জীবনের অনুভূতির কথা নয়, অসংখ্য বিচিত্র অনুভূতির অন্তরালে যদি কোনো অপরিবর্ত্তনীয় দুর্নিরীক্ষ্য সত্য থাকে, এ-সমস্ত রচনায় তারই যেন সন্ধান। 'পত্রপুটে'র কবিতাগুলো বিশেষ ক'রেই এই ধরণের। কবিতার যে-দিকটা রহস্যের, যে-দিকটা চকিত অভাবনীয়ের আলোয় দীপ্ত, এই ধরণের রচনায় সেটা অপ্রাসঙ্গিক। গীতিকবিতার ইঙ্গিতের ঐশ্বর্য্য এখানে আশা করা যায় না; এখানে বিশাল চিন্তার প্রসারিত ডালপালার মর্ম্মর। পর-পর পনেরোটি গদ্য কবিতায় এই মর্ম্মর আমাদের কানে ও মনে এসে লাগছে। সব কবিতাই এক হিসেবে স্বগতোক্তি, এ-কবিতাগুলো বিশেষ ক'রে আত্ম-ভাষণ। যত দ্বন্দ্ব যত সমস্যার মেঘ পশ্চিমের সূর্য্যের চারদিকে ঘন হ'য়ে এসেছে,

এখানে তারই অপূর্ব্ব বিচ্ছুরিত বর্ণচ্ছটা। জীবনের মূল সূত্রগুলি নিয়ে এই যে জল্পনা এ থেকে অনেক ভালো প্রবন্ধের সৃষ্টি হ'তে পারতো, রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন তাকে কাব্যের সংহত রূপ।

বাঙলা গদ্য ছন্দ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনার ক্ষেত্র প'ড়ে রয়েছে। এ-বিষয়ে নানারকম মত শুনেছি, অনেক অদ্ভুত মতও শুনেছি। কিন্তু গদ্য ছন্দ নিয়ে এখন পর্য্যন্ত কেউ কোনো প্রামাণ্য আলোচনা করেছেন ব'লে আমি জানি না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সদ্য প্রকাশিত 'ছন্দ' বইয়ে ও-বিষয়ে যেটুকু বলেছেন তাতে তার ভাবের ও রসের দিকটাই বুঝিয়েছেন, প্রয়োগ-রীতির প্রশ্নটা গেছেন এড়িয়ে। অথচ গদ্য ছন্দের আঙ্গিকের নির্ণয় এখনো অস্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথের নব-নব রচনার উদাহরণ থেকে অর্ব্বাচীনের যে-শিক্ষা লাভ হয়, তা ছাড়াও আলোচনা, ইঙ্গিত ও নির্দেশের প্রয়োজন আছে। 'পত্রপুট' প'ড়েই এ-কথা বিশেষ ক'রে মনে হ'লো। কেন বলি। 'পুনশ্চর' ভূমিকাতেই শুধু রবীন্দ্রনাথ গদ্য ছন্দের দু' একটা স্বাভাবিক নিয়মের উল্লেখ করেছেন। সে-নিয়ম পণ্ডিতের অনুশাসন নয়, গদ্যের প্রকৃতির মধ্যে অনিবার্য্যরূপেই তা আছে। যেমন, বিশেষ ক'রে পদ্যেই ব্যবহার্য্য শব্দ গদ্য ছন্দে বর্জনীয়। এ-নিয়ম লঙ্ঘন করা অসম্ভব এ কথা নির্ভয়েই বলা যায়। (আমা তোমা হেন সম প্রভৃতি কথা পদ্যের এলাকার বাইরে এলেই অন্ত্যজ।) রবীন্দ্রনাথে এর ব্যতিক্রম কখনোই দেখিনি, তবু

গিরিশৃঙ্গমালার মহৎ মৌনে ধ্যাননিমগ্না পৃথিবী,
নীলাম্বুরাশির অতন্দ্রতরঙ্গে কলমন্দ্রমুখরা পৃথিবী,
অন্নপূর্ণা তুমি সুন্দরী, অন্নরিক্তা তুমি ভীষণা।
একদিকে আপক্কধান্যভারনম্র তোমার শস্যক্ষেত্র,
সেখানে প্রসন্ন প্রভাতসূর্য্য প্রতিদিন মুছে নেয় শিশিরবিন্দু
কিরণ-উত্তরীয় বুলিয়ে দিয়ে।

অস্তগামী সূর্য্য শ্যামশস্যহিল্লোলে রেখে যায় অকথিত এই বাণী—
"আমি আনন্দিত।"
অন্যদিকে তোমার জলহীন ফলহীন আতঙ্কপাণ্ডুর মরুক্ষেত্রে
পরিকীর্ণ পশুকঙ্কালের মধ্যে মরীচিকার প্রেতনৃত্য।

উদ্ধৃত অংশ প'ড়ে (এবং এ-রকম 'পত্রপুটে'র পাতায় আরো আছে) মনে একটা সংশয়ের ধাক্কা লাগেই। সমাসে সন্ধিতে অনুপ্রাসে, অমৌখিক সংস্কৃত শব্দে এ রচনাংশটি এমনই জমকালো যে এর সঙ্গে পদ্য ছন্দের তালের বন্ধনই যেন মানাতো, এ যেন কোনো গম্ভীর কল্লোলিত ছন্দ থেকে ছিঁড়ে এসে হঠাৎ ভুল ক'রে ছড়িয়ে গেছে গদ্য হ'য়ে। আমা তোমা হেন-তে যে-কারণে আপত্তি, ঠিক সেই কারণেই কি গিরিশৃঙ্গ-মালা নীলাম্বুরাশি অতন্দ্রতরঙ্গ কলমন্দ্রমুখরাও অবৈধ নয়? গদ্য প্রকৃতই মুখের ভাষা নয় কি, বিশেষ ক'রে গদ্যে যখন কবিতা লেখা হয়? যৌক্তিক গদ্যে বরঞ্চ গ্রন্থগত সংস্কৃত শব্দের স্থান আছে, কেননা সেখানে যথাযথ বোধগম্যতাই উদ্দেশ্য। কিন্তু কবিতা চলে ভাবের ইঙ্গিত নিয়ে, এবং গদ্যে সেটা ফোটে মৌখিক ভাষার প্রাকৃত লীলাতেই। মুখের ভাষার সহজ প্রাণ-স্পন্দনের জোরেই গদ্য কবিতা হ'য়ে উঠতে পারে। এ-শিক্ষা আমার রবীন্দ্রনাথের কাছেই হয়েছে,। সুতরাং আলোচ্য কাব্য-গ্রন্থে 'সংস্কৃত' শব্দের ও বাক্য-ভঙ্গির আতিশয্য দেখে নিজের সংশয় প্রকাশ না-ক'রে পারলাম না। যে-ভাষা চিত্রাতে সোনার তরীতে সঙ্গত ছিলো, সেটাই কি হ'তে পারে গদ্য ছন্দের উপযুক্ত বাহন, না কি গদ্য ছন্দের জন্য নতুনরকমের ভাষা সৃষ্টি ক'রে ও বাঁচিয়ে রাখতে হবে, কবির দরবারে এই প্রশ্নটি আমি উত্থাপন করছি। এর জবাব পাওয়া প্রয়োজন—কেননা রবীন্দ্রনাথ এখন যা করছেন কি করবেন তার উপর গদ্য ছন্দের ভবিষ্যৎ পরিণতি অনেকখানিই নির্ভর করছে।

বুদ্ধদেব বসু

জি, কে, চেস্‌টারটন

সর্বতোমুখিতা এই বিংশ শতাব্দীর লেখকদের একটা বিশেষত্ব ব'লে মনে হয়। তার কারণ বোধ হয় এই যে ইয়োরোপেও সাহিত্য পুরোপুরি একটা পেশা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে এই বিংশ শতাব্দীতেই। তা ছাড়া, ইংলণ্ডের সাহিত্যের সাত শতাব্দীর ঐতিহ্যের ফলে এখন সাহিত্যের সবগুলি রূপই পূর্ণ পরিণত: একদিকে যাঁর জন্মগত ক্ষমতা অন্যদিক-গুলো তাঁর একেবারে অনধিগম্য কখনোই থাকে না। এর ফলে কিছু হয়-তো যত্নহীনতা কি অনধিকারপ্রবেশ হয়েছে, কিন্তু এ-কথাও মানতে হবে যে এরই ফলে আমরা সম্প্রতি কয়েকটি অতি আশ্চর্য্য লেখককে পেয়েছি। জি, কে চেস্‌টারটন ছিলেন তার মধ্যে সব চেয়ে আশ্চর্য্য। আধুনিক সর্বতোমুখিতার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ তিনি। তাঁর অজস্র গদ্য রচনা গল্পে প্রবন্ধে সমালোচনায়, অফুরন্ত হাসিতে ও তামাসায়, তর্কে ও তত্ত্বে, রহস্যে ও রোমহর্ষণে, ব্যঙ্গে ও বিজ্ঞতায় বিসর্পিত; এ-যুগের ইংরিজি গদ্যের তিনি নিঃসংশয়েই অন্যতম নায়ক। হয়তো তাঁর এই অপরূপ ও অতি-প্রচুর গদ্যই তাঁর কবিতাকে একটু আড়াল করেছে। তবু কবি হিসেবেও তিনি অসাধারণ। কাব্যের রাজ-সভা পর্য্যন্ত যাঁদের পথ পরিষ্কার হয় না, তাঁদের মধ্যেও যে ম্রিয়মাণ প্রতিভার বিদ্যুৎ-ঝল্‌সানি দেখা যায়, এ-দৃষ্টান্তের অভাব ইংরিজি ভাষায় অন্তত নেই। মাত্র বছর দুই পূর্বে প্রকাশিত চেস্‌টারটনের সমগ্র সংগৃহীত কাব্য পড়লে বোঝা যায়, তিনি শুধু কিপ্‌লিঙ-ঘেঁষা ছন্দে ইংরেজ মাতালের তৈরি টলোমলো রাস্তার তারিফ ক'রেই ক্ষান্ত হননি, তাঁর কাব্য-প্রতিভাও একান্ত নিজস্ব ও বিশেষরকমের, বহুল ও বিচিত্র তার প্রকাশ। তাঁর চিত্ররূপময় বর্ণাঢ্য ব্যক্তিত্ব ফুটেছে তাঁর কাব্যের প্রতি পংক্তিতে; তাঁর খেয়ালী কল্পনার কত অদ্ভুত রূপক ক্ষণে-ক্ষণে চমক লাগায়। তাঁর যে জীবনদর্শন অন্যান্য

রচনারাশিতে পাওয়া যায়, তাঁর কবিতায় সেটাই প্রতিফলিত। আধুনিক 'বৈজ্ঞানিক' মনোভাবের তিনি মহৎ শত্রু; যন্ত্র-নির্ভর, যুক্তি-নির্ভর জীবনের বন্ধ্যা বিবর্ণতাকে আক্রমণ ক'রে কখনো তিনি ক্লান্ত হতেন না। তাঁর রোমান ক্যাথলিক মন যেন গথিক গির্জার অভ্যন্তরেরই মত; কল্পনার অসংখ্য রঙে আর স্বপ্নের আঁকাবাঁকা ছায়ায় সেখানে চিরন্তন গোধূলিবেলার রচনা। আধুনিক সভ্যতায় সবই অতিশয় ঋজু, অতিশয় স্পষ্ট; বাইরের ঐশ্বর্যের আড়ালে তার শূন্যতা ও ব্যর্থতা ছিলো চেস্টারটনের প্রধান আক্রমণের বিষয়। তিনি ছিলেন রহস্যের পক্ষে, অনিশ্চিত অস্পষ্টের পক্ষে, রুটিনের বদলে খেয়ালের পক্ষে, যূথবদ্ধ আমোদের বদলে ব্যক্তিগত স্বতঃস্ফূর্ত উপভোগের পক্ষে।

বিদ্রূপের সহজ ক্ষমতা ছিলো তাঁর। সে-বিদ্রূপে ঝাল ছিলো না, ধার ছিলো। তাঁর অনেক কবিতায় আছে সরস ঠাট্টার ছলে মর্মান্তিক সত্যের উচ্চারণ। কবি হিসেবে তাঁকে কিছু সেকেলেই বলতে হয় বুঝি। অন্তত, আধুনিক বলতে কবিতার যে-নতুন ও বিশেষ একটা ভঙ্গি আজকাল সূচিত হয়, সেটা ছিলো না তাঁর কাব্যে। তাঁর ঠিকুজি টানতে হয় উনিশ শতকের শেষ থেকেই, কিপলিঙ থেকে; দোলায়িত ছন্দে আর মর্মরিত মিলে আমাদের দেশের বৃষ্টির মত ঝমঝম ক'রে বাজে তাঁর কবিতা। আধুনিক কালের কোনো-কোনো মহৎ কবি থেকে তিনি এই হিসেবেও আলাদা যে তাঁর কবিতা প'ড়েই বোঝা যায়। যাঁরা আধুনিকতার উচ্চতম শিখরে, তাঁরা হয়-তো এটা কিছুতেই বরদাস্ত করবেন না: জটিলতা ও দুর্বোধ্যতাই যে সাহিত্যিক নীলরক্তের চিহ্ন। কিন্তু অনেক সময় দুর্বোধ্যতার পিছনে দম্ভ কি অক্ষমতা ছাড়া কিছুই থাকে না। চেস্টারটনের কবিতা সাধারণের জন্য, যে-অর্থে ফুল পাখি শিশু সাধারণের উপভোগের জিনিস। ও-সব বস্তুর রস-গ্রহণ বিশেষ কোনো শিক্ষাসাপেক্ষ নয়, অথচ বিশেষ শিক্ষা ও সাধনা যাঁর আছে তাঁর পক্ষেও ও-সব ভালো লাগা একেবারে অসম্ভব নয় ব'লেই আশা

করি। জীবনের যত সহজ, সাধারণ, অ-শিক্ষিত, প্রবৃত্তিগত উপভোগ, চেস্টারটনের কবিতা তা-ই নিয়ে। প্রায়ই তাঁর সুর ঈষৎ ঠাট্টার, অবারিত উচ্চহাসির, তিনি যেন চোখ মেলে পৃথিবীর দিকে তাকিয়েই মাতাল হ'য়ে আছেন। কখনো অপ্রত্যাশিত মুহূর্তে গম্ভীর কাব্য উচ্চারণও শুনেছি তাঁর মুখে, আবার কখনো যেন একেবারেই খুসি সামলাতে না পেরে তাঁর ভাষা সীমা ছাড়িয়ে আবোল-তাবোল হ'য়ে উঠেছে।

They haven't got no noses
The fallen sons of Eve;
Even the smell of roses
Is not what they supposes; . . .
And goodness only knowses
The Noselessness of Man.

এই উচ্ছ্বসিত উচ্চহাসির আনন্দ আধুনিক জীবনে ও সাহিত্যে ক্রমশই বিরল হ'য়ে আসছে। তাঁর অজস্র লেখার ভিতর দিয়ে যে-একটি হাসিখুসি খামখেয়ালি রঙদার অথচ নির্ভীক সত্যান্বেষী মানুষের সঙ্গে এতদিন ধ'রে পরিচয়, আজ তাঁর অভাবে নিজেকে সত্যই দরিদ্র মনে হচ্ছে।

দুই ও তিন

'ছন্দ' ব'লে সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথের যে-বইটি বেরিয়েছে তার প্রবন্ধ-গুলিতে বাঙলা ছন্দের মূলসূত্র যত সহজে যেমন স্পষ্ট ক'রে ব্যক্ত হয়েছে তেমন এ-পর্যন্ত আর কোথাও হয়েছে ব'লে জানিনে। এ-ধরণের আলোচনা কবির পক্ষেই সম্ভব, পেশাদার পণ্ডিতের পক্ষে নয়। এতে ছন্দের বাইরের রূপটার চুলচেরা বিশ্লেষণের চাইতে অন্তরের রহস্যই উন্মোচন হয়েছে বরঞ্চ। কোনো দুরূহ পরিভাষার সাহায্য না নিয়ে বাঙলা ছন্দকে রবীন্দ্রনাথ মোটামুটি দু' মাত্রা ও তিন মাত্রার ছন্দে

ভাগ করেছেন। এ-বিভাগটা বোঝা খুবই সহজ। কোনো এক ছান্দসিক কোনোকালে এর জন্যে ধ্বনিমাত্রিক ও শব্দমাত্রিক এ দুটি শব্দ তৈরি করেছিলেন। প্রভেদটা আসলে এইখানে: দুইমাত্রার ছন্দে যুক্তাক্ষরকে একমাত্রা ব'লে ধরা হয়, তিনমাত্রার ছন্দে ধরা হয় দুই মাত্রা বলে। কথাটা সম্পূর্ণ হয় এই বললে যে দুইমাত্রার ছন্দে যুক্তাক্ষরকে এক ব'লেও ধরা যেতে পারে, অবস্থাভেদে দুই বললেও দোষের হয় না; কিন্তু তিনমাত্রার ছন্দে যুক্তাক্ষরকে দুই না-ধরলেই ছন্দ কাটবে। এ থেকেই সূচিত হচ্ছে যে দুই মাত্রার ছন্দে স্বাধীনতা বেশি, ওস্তাদের হাতে তার সঙ্কুচন প্রসারণ অতি অনায়াসেই চলে; তিন মাত্রার ছন্দ সঙ্কীর্ণ, একেবারে ইঞ্চি-মাপা, তাতে যেটুকু ধরে তার বেশি আর ধরে না।

দুই মাত্রার ছন্দের মূল ছাঁচ হ'লো পয়ার। পয়ারটা খুব ব্যাপক অর্থে ধরছি; কাশীরাম দাসও পয়ার, বলাকাও পয়ার। পয়ারের আশ্চর্য নমনীয়তা—প্রায় অপরিসীম সঙ্কুচন ও প্রসারণের ক্ষমতা—এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথেরই রচনা ও আলোচনা থেকে আমাদের শিক্ষা হয়েছে। কিন্তু 'ছন্দ' বইটিতে তিনি যেন মোটের উপর তিন মাত্রার ছন্দের প্রতিই পক্ষপাত করেছেন। এতে আমি একটু অবাক হয়েছি। পয়ারের প্রতি তিনি এই ব'লে কটাক্ষপাত করেছেন যে ওটা 'সাধু' ভাষার ছন্দ: আর তিনমাত্রার ছন্দ হচ্ছে বাঙলার নিজস্ব, বাউল গানে দেখা যায় তার আদিরূপ। তারপর হসন্ত বেশি থাকে বলে তিনমাত্রার ছন্দে শব্দের এমন একটি ঢেউ-তোলা ছল্‌ছলানি শোনা যায়, পয়ারে যা কিছুতেই সম্ভব নয়। সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন যে তিন-মাত্রার প্রতি আছে তাঁর বরাবরকার ব্যক্তিগত দুর্বলতা।

শেষের কথাটা দিয়েই আরম্ভ করি। রবীন্দ্রনাথের তিনমাত্রার রচনা অসংখ্য, কিন্তু হিসেব করলে দেখা যাবে তার বেশির ভাগই গান। দুই মাত্রার রচনাও তাঁর অসংখ্য, সেগুলি সবই কবিতা, গান নয়। হিসেব করলে দেখা যাবে যে তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলির বেশির ভাগই

পয়ার জাতীয় ছন্দে লেখা ('ক্ষণিকা' ও আখ্যানের কবিতা বাদ দিয়ে।) বাউল গান গানই, কবিতা নয়; এমন কি, রবীন্দ্রনাথের গানও সুরে বেঁধে গাওয়ার জন্যেই। গানের শ্রেষ্ঠ বাহন তিন মাত্রার ছন্দ, তিনমাত্রায় নির্ভর ক'রে চলেছে বাঙলার নিজস্ব গানের ছন্দ। পয়ারও বাঙলারই প্রাকৃত ছন্দ, পয়ার জাতীয় ছন্দই প্রথম থেকে বাঙলা কবিতার প্রধান অবলম্বন, এবং রবীন্দ্রনাথের হাতে প'ড়ে পয়ারের আশ্চর্য প্রসার ও পরিণতি ঘটেছে। পয়ারকে যে ইচ্ছেমত বাড়ানো কমানো যায়, এবং তার ফলে যে গভীর ও বিচিত্র ধ্বনির সৃষ্টি হয়, এটা রবীন্দ্রনাথেরই আবিষ্কার। হেম বাঁড়ুয্যে নবীন সেনের নিষ্প্রাণ চতুর্দশীর অসহ্য পৌনঃ-পুনিকতার সঙ্গে 'নিষ্ফল কামনা' কি 'স্বর্গ হইতে বিদায়' কি 'বলাকা'র মনে-মনে একবার তুলনা করলেই চলবে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথই যখন বলেন যে পয়ার জাতীয় ছন্দ 'সাধু' শব্দের চাপে স্বভাবতই স্তিমিত, তখন খুব বেশি ক'রেই অবাক লাগে। স্তিমিত যখন হয়, সেটা কবির অক্ষমতা, ছন্দের স্বাভাবিক দুর্বলতা নয়। অক্ষমের হাতে তিনমাত্রার ছন্দ শুধু স্তিমিত নয়, অসহ্যরকম ভালগার হ'য়ে ওঠে। 'করিতেছি' আর 'করছি' এ দুটো শব্দের মধ্যে দ্বিতীয়টাতে সুর বেশি, জোরও বেশি কবির এ-কথা কেউ অস্বীকার করবে না। কিন্তু তাই ব'লে পয়ারকেই কি দোষ দেয়া যায়? 'সাধু' ক্রিয়াপদ কি পয়ারের ধর্ম? অবশ্য প্রাক্‌-রবীন্দ্র কবিদের রচনায় পয়ারে ক্রিয়াপদমাত্রেই 'সাধু' কিন্তু রবীন্দ্রনাথই দেখিয়েছেন যে পয়ারে প্রাকৃত ক্রিয়াপদ অনায়াসেই চলে, এবং 'করিতেছি'র মত বিশ্রী শব্দ এড়িয়ে যেতে খুব বেশি কলাকৌশলও লাগে না। ন্যূনতম ক্রিয়াপদ ব্যবহার ক'রে 'নিষ্ফল কামনা'র মত আশ্চর্য কবিতা লেখাও সম্ভব। এতদিন রবীন্দ্রনাথের পয়ারে 'সাধু' ও চলতি দু' রকমের ক্রিয়াপদই থাকতো, কোনোখানেই কখনো খট্‌কা লাগেনি। তারপর 'পরিশেষে' তিনি দেখিয়েছেন পয়ার কেমন ক'রে 'সাধু' ভাষাকে সম্পূর্ণ বর্জন ক'রে চলতে পারে। ভবিষ্যতের পয়ার ঐদিকেই হয়তো মোড় নেবে।

ধ্বনির দিক থেকে পয়ার খাটো এ-কথা কিছুতেই স্বীকার করবো না। বরং এ-কথাই জোর ক'রে বলবো যে গভীর ধ্বনির কল্লোল, সূক্ষ্ম-বিসর্পিত সুরের বৈচিত্র্য পয়ারেই সম্ভব, তিনমাত্রায় কিছুতেই নয়। তিনমাত্রায় ঢেউ ওঠে বটে, কিন্তু সে-ঢেউ নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী, সে-ঢেউ কানেই মিলিয়ে যায়, মরমে পৌঁছতে পারে না। তিন মাত্রা বাজে, কিন্তু সে-বাজনা ঠুন্‌কো ও হালকা ধরণের। কেননা তাতে ঠিক যেটুকু ধরে তার বেশি কিছুতেই ধরে না। তাতে বৈচিত্র্য নেই, নতুন সম্ভাবনা নেই, কবির নিজস্ব সৃষ্টির জায়গা নেই। তার তালটা স্থূল। যতক্ষণ প'ড়ে যাওয়া যায় কান খুসি হয়, কিন্তু পড়া হ'য়ে গেলে মনের মধ্যে প্রতিধ্বনি নাও থাকতে পারে। পয়ারের প্রতিধ্বনি গভীর। পয়ার হানা দেয়। পয়ার যদি সত্যি-সত্যি ভালো লেখা হয় তার যে ধ্বনির বেগ ও লীলা, পদে-পদে যে অদ্ভুত বৈচিত্র্য বাঙলাভাষায় আর-কিছুতেই তা দেখা যাবে না। তিনমাত্রার দাবি অনস্বীকার্য্য, গানে কি সঙ্গীতজাতীয় গীতি-কবিতায় তা খুব বেশিই কাজে লাগে; কিন্তু এও ঠিক যে তার কাঠামোটার একেবারেই কোনো-রকম নড়চড় হয় না ব'লে তাকে নিয়ে খুব বেশি দূরও যাওয়া যায় না! তার একটাই সুর। কিন্তু পয়ার যেন কোনো বিশাল আশ্চর্য্য যন্ত্র, গুণীর হাতে তা থেকে যে-কোনো সুর বেরোয়। অত্যন্ত গম্ভীর থেকে অত্যন্ত চটুল, অত্যন্ত মন্থর থেকে অত্যন্ত দ্রুত—পয়ার সবই হ'তে পারে। তিনমাত্রার একরকম ছাড়া হবার উপায় নেই। পয়ারের ছাঁচে অনেকখানি ফাঁক থাকে, কবি সেটা ইচ্ছেমত ভরিয়ে কি না-ভরিয়ে নানারকম ধ্বনি সৃষ্টি করতে পারেন; তিনমাত্রা সর্বদাই কানায়-কানায় ঠাসা, তার বেশিও নেই কমও নেই। পয়ারের বিরুদ্ধে 'সাধুতা'র অভিযোগ এখন কি আর আনা যায়, যখন দেখা যাচ্ছে চলতি ভাষাকে সহজেই সে আপন ক'রে নিচ্ছে?

সম্পাদক : বুদ্ধদেব বসু : প্রেমেন্দ্র মিত্র : সহকারী সম্পাদক সমর সেন :
৭১।১নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস হইতে প্রভাতচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কবিতা

দ্বিতীয় বর্ষ, পৌষ, ১৩৪৩ দ্বিতীয় সংখ্যা

মুক্তপথে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাঁকাও ভুরু দ্বারে আগল দিয়া,
চক্ষু করো রাঙা,
ঐ আসে মোর জাত-খোয়ানো প্রিয়া
ভদ্র-নিয়ম-ভ'ঙা।
আসন পাবার কাঙাল ও নয় তো
আচার-মানা ঘরে,—
আমি ওকে বসাব হয় তো
ময়লা কাঁথার পরে।
সাবধানে রয় বাজার দরের খোঁজে
সাধু গাঁয়ের লোক,
ধুলার বরণ ধূসর বেশে ও যে
এড়ায় তাদের চোখ।
বেশের আদর করতে গিয়ে ওরা
রূপের আদর ভোলে ;—
আমার পাশে ও মোর মনোচোরা
একলা এসো চ'লে।

হঠাৎ কখন এসেছ ঘর ফেলে
তুমি পথিক-বধূ,
মাটির ভাঁড়ে কোথা থেকে পেলে
পদ্মবনের মধু ?
ভালোবাসি ভাবের সহজ খেলা
এসেছ তাই শুনে,
মাটির পাত্রে নাইক আমার হেলা
হাতের পরশগুণে !
পায়ে নূপুর নাই রহিল বাঁধা
নাচেতে কাজ নাই,
যে-চলনটি রক্তে তোমার সাধা
মন ভোলাবে তাই।
লজ্জা পেতে লাগে তোমার লাজ
ভূষণ নেইক ব'লে,
নষ্ট হবে নেই তো এমন সাজ
ধুলোর পরে চ'লে।
গাঁয়ের কুকুর ফেরে তোমার পাশে
রাখালরা হয় জড়ো,
বেদের মেয়ের মতন অনায়াসে
টাট্টু ঘোড়ায় চড়ো।

ভিজে শাড়ি হাঁটুর পরে তুলে
পার হ'য়ে যাও নদী,
বামুনপাড়ার রাস্তা যে যাই ভুলে
তোমায় দেখি যদি।
হাটের দিনে শাক তুলে নাও ক্ষেতে
চুপড়ি নিয়ে কাঁখে,
মটর কলাই খাওয়াও আঁচল পেতে
পথের গাধাটাকে।
মানো নাকো বাদল দিনের মানা,
কাদায় মাখা পায়ে
মাথায় তুলে কচুর পাতাখানা
যাও চ'লে দূর গাঁয়ে।
পাই তোমারে যেমন খুসি তাই
যেথায় খুসি সেথা।
আয়োজনের বালাই কিছু নাই
জানবে বলো কে তা।
সতর্কতার দায় ঘুচায়ে দিয়ে
পাড়ার অনাদরে
এসো ও মোর জাত-খোয়ানো প্রিয়ে
মুক্তপথের পরে।

৬।১১।৩৬

গীতি-গুচ্ছ

হেমচন্দ্র বাগচী

অপরূপ বিরহ

মনে আমার একটি অপরূপ বিরহ জাগে
গানের স্বরের মত সে বিরহ।
কত বেদনার ধারা এসে যেন মিলেছে মনে—
বনপ্রান্তের বিষণ্ণ ছায়ার মত সে বিরহ।

বিস্মৃত দিনের কাহিনী

বারে বারে একটি স্বর এসে যেন বাজে
হৃদয়ের মধ্যে নিঃশব্দচরণে নেমে আসে
ছিন্নবিচ্ছিন্ন বিস্মৃতদিনের কাহিনী।
জীবনের খর উত্তাপের উপর নামে অশ্রান্ত বর্ষণ
চিত্ততল স্নিগ্ধ হ'য়ে আসে।

চেয়ে চেয়ে দেখি

কতদিন চেয়ে চেয়ে দেখি
চোখে রঙের নেশা লাগে—
বর্ষার ভরা নদী, কাশফুল,
মাঝে মাঝে এক একখানি নৌকো ভেসে চলেছে,
গাঁয়ের লোকগুলি চলেছে নিঃশব্দে
দেখি আর মনে হয়—
এ যেন পৃথিবীর অর্দ্ধাবগুণ্ঠিত রহস্যময় মুখ
নেপথ্যে চলেছে অযুত আয়োজন
এই চিত্রটিকে তুলে ধরবার জন্য।

বর্ষার দিনে

বর্ষার দিনে গঙ্গার তটরেখায় রেখায়
চলেছে আমার মন।
বাব্‌লাগাছের হরিদ্রাভ ফুল—
অসংখ্য পাখীর একতান ঝঙ্কার
শালিখ পাখীর মেলা—
এই শ্যামল শোভার মধ্যেও
হৃদয়ের কান্না থামে না কিছুতেই।

বড় সুন্দর এই পৃথিবী

বড় সুন্দর এই পৃথিবী।
সাধ যায় এই
অপরূপ সবুজ শোভার মধ্যে
বেঁচে থাকি কিছুকাল।
শুধু দেখি আর স্বপ্নের মায়াভুবন
রচনা করি
অগণন মুহূর্ত্তের ফাঁকে ফাঁকে।

ছুটি

মনে হয় যেন ছুটি পেয়েছি
সমস্ত চিরাচরিত মানব-পন্থা থেকে
মুক্তি পেয়েছি আমার মনে।
ভিতরের মানুষটাকে কে জানে?
সে শুধু বীণা বাজায় আর গান গায়
আর উদাসীন দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে
যেখানে শ্যামল বনের অন্তরালে
ভীরু কাঠবিড়ালী ত্বরিত-গতিতে
যাওয়া-আসা করে নিঃশঙ্ক, নিঃসঙ্কোচ!

খাতা

খাতা আমার শেষ হ'য়েছে।
এখনকার টুকুরো জীবন সুদূর সমগ্রতাকে পায় না।
তাই ছোট ছোট ভাবনাগুলি মনের তারে তারে যে আঘাত দেয়
তারই কম্পন রেখে যেতে ইচ্ছা করে
কলমের আখরে আখরে।

মানসশিল্পী

কাগজে প্রকাশের তাগিদ নেই
আর রচনার।
এই সময়েই মানসশিল্পীর আনন্দ।
ব'সে ব'সে ছবির পর ছবি,
রেখার পর রেখা
রঙের পর রঙ।
অরসিকের করলাঞ্ছন থেকে নিশ্চিন্ত পলায়ন।

প্রচ্ছন্না

এক এক সময় অনুভব করি
পৃথিবীর বক্ষবিদারণ যে স্বত-উৎসারিত রসধারা,
আমি যেন তা'রই প্রান্তরেখায় বিস্মিতদৃষ্টি বালকের মত ব'সে আছি।
চিরকাল যেন স্তম্ভিত হ'য়ে আছে
আমার সেই মুহূর্ত্তদর্শনের কাছে।
মনে মনে বলি,
হে প্রচ্ছন্না, তোমার গুণ্ঠন আর অপসারিত ক'রো না
অত প্রখরতা সইব কি ক'রে?

মুগ্ধা

মুগ্ধে, এত ঐশ্বর্য্য তোমার?
চেয়ে চেয়ে চোখের পলক যেন আর পড়ে না।
এত স্তব্ধ তুমি, মনে হয় ঘুঘুর ডাকের মধ্যেও
এত অলস স্তব্ধতা নেই।
স্থির হ'য়ে আছি
সমস্ত দেহ মন
একটি অপূর্ব্ব আনন্দ-চেতনার কেন্দ্রে আত্মহারা।
তিল তিল সামান্যকে নিয়ে তুমি অসামান্যা।
আমাকে শতধা বিচ্ছিন্ন ক'রেও আশা মেটে না কিছুতেই।

ভাঙা কোঠাবাড়ি

অনেক দিনের ভাঙা কোঠাবাড়ি,
কাঁটাল আম নারকেলের বাগান,
তা'রই ফাঁকে ফাঁকে দেখি
একটি মেয়েকে
শ্যামল বনশোভার মত,
মনের পীড়া যে দূর করে
এমন মেয়ে।

সে আমার জলাঙ্গী

স্তোত্রের আবৃত্তিগুঞ্জন শুনতে পাই—
কাপড় কাচার শব্দ,
হাঁসের পাখাঝাড়ার শব্দ,
জলযন্ত্রের নিত্য আবর্ত্তমান ঝক্-ঝক্ শব্দ,
মনে হয়, নদী চলেছে এঁকে বেঁকে
আমার মনের নদী
কাশফুলে ভ'রে গেছে তা'র দুই তীর।
কৃষাণেরা কাজ করছে ক্ষেতে
বধূরা সারি বেঁধে চলেছে পথে,
সে আমার জলাঙ্গী।

কল্যাণী বধূ

যেখানে কল্যাণীবধূ আপন নীড় রচনা করে,
যেখানে তা'র মঙ্গল হস্তের কাঁকণ বাজে,
যেখানে অতিথি ভিক্ষুক সম্মানিত,
ইচ্ছা করে, আমি সেই নিভৃত নীড়ের দ্বারদেশে একবার দাঁড়াই
লোক-লোকান্তর উত্তীর্ণ হ'বে যে জীবনধারা,
সেই জীবনকে সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে অনুভব কর্‌তে সাধ যায়।

কবির ভাবনাধারা

কবির ভাবনাধারাকে অনুসরণ কর্‌বে কে?
আলসী মনতরীতে তা'র যাত্রা,
শরতের লঘুমেঘের মত তার ভাবনা।
কোথাও বাঁধা পড়ে না, দাগ থাকে না কিছুতেই—
ঘন জনতার মধ্যেও তার নির্জ্জন বাস।

মনের শিথিল ভাবনাগুলি

মনের শিথিল ভাবনাগুলি আশ্বিনের শিথিলবৃন্ত শেফালির মত
শ্যামল দূর্ব্বার উপরে ঝ'রে পড়্‌তে চায়।
শিশিরে ঝলমল শ্যামল দূর্ব্বা,
আর অশ্রুতে টলমল রূপসায়র।
ইচ্ছা করে সারাদিন কান পেতে থাকি
এই বিচিত্র জগতের বিচিত্র ধ্বনিঝঙ্কারের দিকে
শব্দের পর শব্দ, কথার পর কথা
আর তরল গলিতস্বর্ণ প্রভাতরৌদ্রের দিকে চেয়ে থাকি
সারাদিন, সারাদিন।

একটি ছোট পতঙ্গ

কোথায় একটি ছোট পতঙ্গ বাসা বাঁধ্‌ছে
জামগাছের শুক্‌নো কাঠের ভিতরে।
তা'র সেই ক্লান্তিহীন কর্ম্মের তীব্র তীক্ষ্ণ শব্দ এসে লাগ্‌ছে
আমার মস্তিষ্কের স্নায়ুকেন্দ্রে।

অপরূপ শরৎপ্রভাতে সেই শব্দ আমার কত ভালোই না লাগ্‌ছে!
ছোট্ট একটি পাখী বারে বারে ডাকৃছে—কুকুলি কুকুলি!
মনে হয়, এই উপেক্ষিত আবেষ্টনীর মধ্যে সঞ্চিত হ'য়ে আছে
চিরযুগের মধু—
তা' আমাদের কর্ম্মক্লান্ত দৃষ্টির নেপথ্যে।

মহাকাব্য

মানুষের জীবনধারার পরিপূর্ণতা কোথায়?
বিধাতার মহাকাব্য রচিত হচ্ছে
লোক থেকে লোকান্তরে—
আর বিম্বোষ্ঠী প্রিয়ার চটুল চাহনির তলে
কত দেশের অভ্যুদয়, কত প্রশ্নের সমাধান—
কত প্রেরণায় আত্মবিসর্জ্জন।
মানুষের চিরদিনের মহাকাব্য সেইখানেই
তা' সে গুঞ্জরগানেই হোক আর পয়ারেই হোক।

সিন্ধুসারস

জীবনানন্দ দাশ

দু এক মুহূর্ত্ত শুধু রৌদ্রের সিন্ধুর কোলে তুমি আর আমি
হে সিন্ধুসারস!
মালাবার পাহাড়ের কোল ছেড়ে অতিদূর তরঙ্গের জানালায় নামি
নাচিতেছ টারান্‌টেলা—রহস্যের; আমি এই সমুদ্রের পারে চুপে থামি
চেয়ে দেখি বরফের মত শাদা ডানা দুটি আকাশের গায়
ধবল ফেনার মত নেচে উঠে পৃথিবীরে আনন্দ জানায়।

মুছে যায় পাহাড়ের শিঙে শিঙে গৃধিনীর অন্ধকার গান
হে সিন্ধুসারস,
আবার ফুরায় রাত্রি, হতাশ্বাস;—আবার তোমার গান করিছে নির্ম্মাণ
নতুন সমুদ্র এক, শাদা রৌদ্র, সবুজ ঘাসের মত প্রাণ
পৃথিবীর ক্লান্ত বুকে;—আবার তোমার গান
শৈলের গহ্বর থেকে অন্ধকার তরঙ্গেরে করিছে আহ্বান।

জান কি অনেক যুগ চ'লে গেছে ? ম'রে গেছে অনেক নৃপতি ?
হে সিন্ধুসারস,
অনেক সোনার ধান ঝ'রে গেছে জান না কি ? অনেক গহন ক্ষতি
আমাদের ক্লান্ত ক'রে দিয়ে গেছে,—হারায়েছি আনন্দের গতি
ইচ্ছা, চিন্তা, স্বপ্ন, ব্যথা, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান,—এই বর্ত্তমান
হৃদয়ে বিরস গান গাহিতেছে আমাদের—বেদনার আমরা সন্তান ?

জানি না কি ওগো পাখি, শাদা পাখি ওগো নীল মালাবার ফেনার সন্তান !
হে সিন্ধুসারস,
তুমি পিছে চাহনাক', তোমার অতীত নাই, স্মৃতি নাই, বুকে নাই আকীর্ণ ধূসর
পাণ্ডুলিপি ; পৃথিবীর পাখিদের মত নাই শীতরাতে ব্যথা আর কুয়াশার ঘর।
যে রক্ত ঝরেছে তারে স্বপ্নে বেঁধে কল্পনার নিঃসঙ্গ প্রভাত
নাই তব ; নাই নিম্নভূমি—নাই আনন্দের অন্তরালে প্রশ্ন আর চিন্তার আঘাত।

স্বপ্ন তুমি দেখ নি ত',—পৃথিবীর সব পথ সব সিন্ধু ছেড়ে দিয়ে একা
হে সিন্ধুসারস,
বিপরীত দ্বীপে দূরে মায়াবীর আরসীতে হয় শুধু দেখা
রূপসীর সাথে এক ;—সন্ধ্যার নদীর ঢেউয়ে আসন্ন গল্পের মত রেখা
প্রাণে তার,—ম্লান চুল,—চোখ তার হিজল বনের মত কালো ;
একবার স্বপ্নে তারে দেখে ফেলে পৃথিবীর সব স্পষ্ট আলো

নিভে গেছে ;—তুমি স্বপ্ন দেখ নাক'—যেখানে সোনার মধু ফুরায়েছে,
করে না বুনন
হে সিন্ধুসারস,
মাছি আর ; হলুদ পাতার গন্ধে ভ'রে ওঠে অবিচল শালিখের মন,
মেঘের দুপুর ভাসে—সোনালি চিলের বুক হয় উন্মন
মেঘের দুপুরে, আহা, ধানসিড়ি নদীটির পাশে ;
সেখানে আকাশে কেউ নাই আর, নাই আর পৃথিবীর ঘাসে।

তুমি সেই নিস্তব্ধতা চেন নাক' ;—অথবা রক্তের পথে পৃথিবীর ধূলির ভিতরে
হে সিন্ধুসারস,
জান নাক' আজো কাঞ্চী বিদিশার মুখশ্রী মাছির মত ঝরে ;
সৌন্দর্য্য রাখিছে হাত অন্ধকার ক্ষুধার বিবরে ;
গভীর নীলাভতম ইচ্ছা চেষ্টা মানুষের,—ইন্দ্রধনু ধরিবার ক্লান্ত আয়োজন
হেমন্তের কুয়াশায় ফুরাতেছে অল্পপ্রাণ দিনের মতন !

এই সব জান নাক' প্রবালপঞ্জর ঘিরে ডানার উল্লাসে
হে সিন্ধুসারস,
রৌদ্রে ঝিল্‌মিল্ করে শাদা ডানা শাদা ফেনা-শিশুদের পাশে
হেলিওট্রোপের মত দুপুরের অসীম আকাশে !
ঝিক্‌মিক্ করে রৌদ্রে বরফের মত শাদা ডানা,
যদিও এ পৃথিবীর স্বপ্ন চিন্তা সব তার অচেনা অজানা।

চঞ্চল শরের নীড়ে কবে তুমি—জন্ম তুমি নিয়েছিলে কবে
হে সিন্ধুসারস,
বিষণ্ণ পৃথিবী ছেড়ে দলে দলে নেমেছিলে সবে
আরব সমুদ্রে, আর চীনের সাগরে,—দূর ভারতের সিন্ধুর উৎসবে !
শীতার্ত এ পৃথিবীর আমরণ চেষ্টা ক্লান্তি বিহ্বলতা ছিঁড়ে
নেমেছিলে কবে নীল সমুদ্রের নীড়ে !

ধানের রসের গল্প পৃথিবীর—পৃথিবীর নরম অঘ্রাণ
হে সিন্ধুসারস,
পৃথিবীর শঙ্খমালা নারী সেই,—আর তার প্রেমিকের ম্লান
নিঃসঙ্গ মুখের রূপ,—বিশুষ্ক তৃণের মত প্রাণ,
তুমি তাহা কোনোদিন জানিবে না ;—সমুদ্রের নীল জানালায়
আমারি শৈশব আজ আমারেই আনন্দ জানায়।

রাত্রিমাখা ঘাসে

জীবনানন্দ দাশ

একবার নক্ষত্রের দিকে চাই—একবার প্রান্তরের দিকে
আমি অনিমিখে।
ধানের ক্ষেতের গন্ধ মুছে গেছে কবে
জীবনের থেকে যেন ; প্রান্তরের মতন নীরবে
বিচ্ছিন্ন খড়ের বোঝা বুকে নিয়ে বুকে নিয়ে ঘুম পায় তার ;
নক্ষত্রেরা বাতি জেলে—জেলে—জেলে—'নিভে গেলে—নিভে গেলে ?'
ব'লে তারে জাগায় আবার ;
জাগায় আবার।
বিক্ষত খড়ের বোঝা বুকে নিয়ে—বুকে নিয়ে ঘুম পায় তার,
ঘুম পায় তার।

অনেক নক্ষত্রে ভ'রে গেছে এই সন্ধ্যার আকাশ—এই রাতের আকাশ ;
এইখানে ফাল্গুনের ছায়ামাখা ঘাসে শুয়ে আছি ;
এখন মরণ ভালো,—শরীরে লাগিয়া রবে এই সব ঘাস ;
অনন্ত নক্ষত্র রবে চিরকাল যেন কাছাকাছি।

কে যেন উঠিল হেঁচে,—হামিদের খর্‌খুটে কানা ঘোড়া বুঝি !
সারাদিন গাড়ী টানা হ'ল ঢের,—ছুটি পেয়ে জ্যোৎস্নায় নিজ মনে খেয়ে যায় ঘাস;
যেন কোনো ব্যথা নাই পৃথিবীতে,—আমি কেন তবে মৃত্যু খুঁজি ?
'কেন মৃত্যু খোঁজ তুমি ?' চাপা ঠোঁটে বলে দূর কৌতুকী আকাশ।

ঝাউফলে ঘাস ভ'রে,—এখানে ঝাউয়ের নীচে শুয়ে আছি ঘাসের উপরে ;
কাশ আর চোরকাঁটা ছেড়ে দিয়ে ফড়িং চলিয়া গেছে ঘরে।
সন্ধ্যার নক্ষত্র, তুমি বল দেখি কোন্ পথে কোন্ ঘরে যাব !
কোথায় উদ্যম নাই, কোথায় আবেগ নাই,—চিন্তা স্বপ্ন ভুলে গিয়ে শান্তি আমি পাব ?
রাতের নক্ষত্র, তুমি বল দেখি কোন্ পথে যাব ?

'তোমারি নিজের ঘরে চ'লে যাও'—বলিল নক্ষত্র চুপে হেসে
'অথবা ঘাসের পরে শুয়ে থাক আমার মুখের রূপ ঠায় ভালোবেসে ;
অথবা তাকায়ে দেখ গোরুর গাড়ীটি ধীরে চ'লে যায় অন্ধকারে সোনালি খড়ের বোঝা বুকে ;
পিছে তার সাপের খোলস, নালা, খল্‌খল্ অন্ধকার—শান্তি তার র'য়েছে সমুখে ;
চ'লে যায় চুপে চুপে সোনালি খড়ের বোঝা বুকে ;—
যদিও ম'রেছে ঢের গন্ধর্ব্ব কিন্নর, যক্ষ—তবু তার মৃত্যু নাই মুখে।'

স্বপ্ন

জীবনানন্দ দাশ

পাণ্ডুলিপি কাছে রেখে ধূসর দীপের কাছে আমি
নিস্তব্ধ ছিলাম ব'সে ;
শিশির পড়িতেছিল ধীরে ধীরে খ'সে ;
নিমের শাখার থেকে একাকীতম কে পাখী নামি

উড়ে গেল কুয়াশায়,—কুয়াশার থেকে দূর কুয়াশায় আরো।
তাহারি পাখার হাওয়া প্রদীপ নিভায়ে গেল বুঝি ?
অন্ধকার হাত্‌ড়ায়ে ধীরে ধীরে দেশ্‌লাই খুঁজি ;
যখন জ্বালিব আলো কার মুখ দেখা যাবে বলিতে কি পার ?

কার মুখ ?—আমলকী শাখার পিছনে
শিঙের মতন বাঁকা নীল চাঁদ একদিন দেখেছিল তাহা ;
এ ধূসর পাণ্ডুলিপি একদিন দেখেছিল, আহা,
সে মুখ ধূসরতম আজ এই পৃথিবীর মনে।

তবু এই পৃথিবীর সব আলো একদিন নিভে গেলে পরে,
পৃথিবীর সব গল্প একদিন ফুরাবে যখন,
মানুষ র'বে না আর, র'বে শুধু মানুষের স্বপ্ন তখন :
সেই মুখ আর আমি র'ব সেই স্বপ্নের ভিতরে।

হরিণেরা

জীবনানন্দ দাশ

স্বপ্নের ভিতরে বুঝি—ফাল্গুনের জ্যোৎস্নার ভিতরে
দেখিলাম পলাশের বনে খেলা করে

হরিণেরা ; রুপালি চাঁদের হাত শিশিরে পাতায় ;
বাতাস ঝাড়িছে ডানা,—মুক্তা ঝ'রে যায়

পল্লবের ফাঁকে ফাঁকে—বনে বনে—হরিণের চোখে ;
হরিণেরা খেলা করে হাওয়া আর মুক্তার আলোকে।

হীরের প্রদীপ জেলে শেফালিকা বোস যেন হাসে
হিজল ডালের পিছে অগণন বনের আকাশে ;—

বিলুপ্ত ধূসর কোন পৃথিবীর শেফালিকা; আহা,
ফাল্গুনের জ্যোৎস্নায় হরিণেরা জানে শুধু তাহা।

বাতাস ঝাড়িছে ডানা, হীরা ঝরে হরিণের চোখে ;—
হরিণেরা খেলা করে হাওয়া আর হীরার আলোকে।

মরুভূমিতে মৃত্যু

সমর সেন

অলকা

কার নীল চোখে
এখনো সমুদ্রের গভীরতা কাঁপে,
ট্র্যামলাইন শেষ হলে, শেষ হলে ধূসর সহর।
আর এখনো আকাশের মরুভূমিতে
নিঃসঙ্গ পশুর মতো রাত্রি আসে,
ট্র্যামলাইন শেষ হলে, শেষ হলে ধূসর সহর।

রাত্রে, চাঁদের আলোয় শূন্য মরুভূমি জলে
বাঘের চোখের মতো।

অকাল বসন্ত

মহাকাল আজ আমাদের সামনে কাঁপে,—
শোনো, দক্ষিণের হাওয়ায় শোনো,
নতুন জীবনের দুরন্ত ঝড় ;

বুনো হাঁসের দল রোদে-ভরা সমুদ্রের দিকে
তাদের শুভ্র ডানা মেলল :
সামনে দূর সমুদ্রের দীপ্ত দিন !
—আজকের হাওয়ায় শুনি শেষ শত্রুর পদক্ষেপ,
টুকরো টুকরো আশা আর আনন্দ আর শব্দের শেষে
অদৃশ্য শত্রুর পদক্ষেপ।

রামগিরিতে কতদিন

বরফের জলন্ত স্তব্ধতায়
সূর্য্যের উজ্জ্বল বর্শা লাগল ;
সামনে স্বপ্নের মতো উঠেছে পাহাড়ের ঢেউ।
আজো জলন্ত খড়্গের মতো আকাশে
চাঁদ ওঠে,
আজো সামনে
মৃত্যুর মতো মন্থর জীবন।

স্বর্গ হতে বিদায়

ম্লান হয়ে এলো রুমালে
ইভনিং-ইন-প্যারিসের গন্ধ—
হে সহর হে ধূসর সহর
কালিঘাট ব্রিজের উপরে কখনো কি শুনতে পাও
লম্পটের পদধ্বনি
কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও
হে সহর হে ধূসর সহর !
লুব্ধ লোকের ভিড়ে যখন তুমি নাচো
দশ টাকায় কেনা কয়েক প্রহরের হে উর্ব্বশী,
তখন সাড়ির আর তাড়ির উল্লাসে,
অমৃতের পুত্রের বুকে চিত্ত আত্মহারা
নাচে রক্তধারা
আর দিগন্তে জলন্ত চাঁদ ওঠে
হে সহর হে ধূসর সহর।

'আমি নহি পুরুরবা হে উর্ব্বশী',
মোটরে আর বারে
আর রবিবারে ডায়মণ্ডহারবারে
কয়েক টাকায় কয়েক প্রহরের আমার প্রেম,
তারপর সামনে শূন্য মরুভূমি জলে
বাঘের চোখের মতো।

১৯০০

সমুদ্র শেষ হল,
আজ দুরন্ত অন্ধকার ডানা ঝাড়ে
উড়ন্ত পাখীর মতো,
সমুদ্র শেষ হল :
গভীর বনে আর হরিণ নেই,
সবুজ পাখী গিয়েছে ম'রে,
আর পাহাড়ের ধূসর অন্ধকারে
দুরন্ত অন্ধকার ডানা ঝাড়ে
উড়ন্ত সাপের মতো।
সমুদ্র শেষ হল
চাঁদের আলোয়
সময়ের শূন্য মরুভূমি জ্বলে।

মদনভস্মের প্রার্থনা

মাস্তুলের দীর্ঘ রেখা দিগন্তে,
জাহাজের অদ্ভুত শব্দ,
দূর সমুদ্র থেকে ভেসে আসে
বিষণ্ণ নাবিকের গান।

সমস্ত দিন কাটে দুঃস্বপ্নের মতো ;
রাত্রে ধূসর প্রেম : কুসুমের কারাগার।
কতো দিন, কতো মন্থর, দীর্ঘ দিন,
কতো গোধূলি-মদির অন্ধকার,
কতো মধুরাতি রভসে গোঙায়নু,
আজ মৃত্যুলোকে দাও প্রাণ
দূর সমুদ্র থেকে ভেসে আসে
বিষণ্ণ নাবিকের গান।

বিরহ

প্রতিভা বসু

তোমারে ভাবিয়া যবে অন্ধকার রাতে
অপলকে কাটায়েছি তারাদের সাথে
দীর্ঘ বিরহ-বেলা কেটেছে তখন
ঈশ্বরের স্তুতির মতন।

ব্যথায় মূর্চ্ছিত, তবু মধুর মধুর
রোমাঞ্চের মত সেই বিরহের স্বর
মর্ম্মরে ভরেছে মোর হৃদয়ের বন
ঈশ্বরের স্তুতির মতন।

আজ তুমি এত কাছে তারা-ভরা রাতে,
রাখিয়াছি ক্লান্ত হাত তব তপ্ত হাতে।
রাত্রির হৃদয়ে তবু বিরহ-স্পন্দন
ঈশ্বরের বজ্রের মতন।

পরিচ্ছেদ

প্রতিভা বসু

থাক্, থাক্,
এ নিয়ে ভেবে কী হবে ?
যে চাকায় তোমার জীবন চিরকাল ঘুরে চলেছে
সেই ঘূর্ণ্যমান চাকাতেই তুমি থাকো,
তা নিয়ে অভিযোগে আর অভিমানে
মনকে বিব্রত করবো
এমন সময় আমার নেই।
আমি দূরেই স'রে যাই।
আমার সত্তা আর আমার নিঃসঙ্গ জীবন
সে তো কারো নয়—
তাই নিয়ে দূরে স'রে যাই আমি
যেখানে তোমাকে দেখা যায় না
ছোঁয়া যায় না
ডাকলেও শোনা যায় না যেখানে—
দুঃখের দেয়াল ঘেরা সেই অন্ধ অন্ধকারে
মৃত্যুর অতল অন্ধকারে।

২

আমি যদি লিখতে পারতুম তোমার মতো
যদি বোঝাতে পারতুম আমার কথা,
তবে তুমি এমন ক'রে ছিঁড়তে পারতে না আমাকে
কাটতে পারতে না প্রতিমুহূর্ত্তে কুচি-কুচি ক'রে
তোমার ঐ রক্তহীন
হিমেল ঠাণ্ডা নীরবতা দিয়ে—
যদি বোঝাতে পারতুম!

যদি বোঝাতে পারতুম আমার কথা
তবে তুমি আসতেই
তুমি আসতেই আমার বুকের অন্ধকার বেয়ে,
সেই অবরুদ্ধ নিঃসঙ্গ ঘরে
আমি শুনতুম তোমার পায়ের শব্দ
আশায় আর আশঙ্কায়,
আরক্ত হ'য়ে উঠতুম উত্তপ্ত উচ্ছ্বাসে;
আর তুমি আমাকে নিয়ে যেতে
তোমার অপরূপ জ্যোতির্ম্ময় জীবনে
যদি পারতুম
যদি বোঝাতে পারতুম আমার কথা।

একটি সূর্য্যাস্ত

দ্বিজেন্দ্র মৈত্র

চারদিকে পাহাড়ে ঘেরা এই রামগড় হ্রদ
আকাশের মতো কালো এর জলের রঙ্
গভীরতম গভীরতায় সঞ্চিত রেখেচে ইতিহাসকে।
আলো যাবার পথ নেই। আকাশের মত কালো জল।
মধ্যাহ্নের সূর্য্য ঠিক্‌রে পড়ে কালো পাথরের জলে।
বহুদিনকার ঘুমিয়ে পড়া এক নীরব আগ্নেয়গিরি।

আমি যখন দেখলুম এই নির্ব্বাক সমুদ্রকে
তখন এর বুকে বয়ে চলেছে জলন্ত আগুনের স্রোত;
আকাশ থেকে নেমে এসেছে সে আগুন নেভানো চিতার মতো
বিস্তৃত রঙীন শূন্যতায়। বসে রইলেম এই শ্মশানে।
পাহাড়ের পিছনে সূর্য্য নেমে গেল। তার ক্ষণিক স্পর্শ রেখে গেল
পাহাড়ের চূড়ায় গাছের মাথায়, থম্‌কে-থাকা মেঘের অন্তরে অন্তরে।

তাজমহল

দ্বিজেন্দ্র মৈত্র

তোমাকে দেখেছিলুম আগ্রা যাবার পথে।
তুমি উঠলে মাঝের এক স্টেশন থেকে,
চম্‌কে উঠ্‌লেম। একেই তো আমি চেয়েছিলেম,
খুঁজেছিলেম প্রতি মেয়ের চোখে।
তুমি বস্‌লে আমার সাম্‌নাসাম্‌নি, বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে,
তোমার চুলে লেগেছে অস্তগত সূর্য্যের আলো
ঝিক্‌মিক্‌ করে ওঠে তোমার দুল ;
তুমি চেয়ে রইলে গতিশীল দিগন্তের দিকে, অপলক চোখে।
শুধু একটা স্টেশন, তারপর তুমি গেলে নেমে
দৃঢ় অথচ শান্ত পায়ে, ফিরেও চাইলে না আমার দিকে।
সূর্য্য তখন অস্ত গেছে, পশ্চিম আকাশে শেষ রঙীন স্বপ্ন।
আমি নাম্‌লেম আগ্রায়।
প্রকৃত কথা বল্‌তে কী তাজমহল আমার ভালো লাগেনি
দেখতে পাইনি এর মধ্যে শাজাহানের অবিনশ্বর বিরহী আত্মা
দেখ্‌লুম বারবার পূর্ণিমায় ও প্রতিপদের রাতে
যেন প্রাণহীন একটা জড় সৌন্দর্য্য।

ফিরে চলেছি আগ্রা থেকে পুরোনো পথে
বাইরে নিবিড় অন্ধকার, ট্রেন চলেছে হু-হু করে
গাছ পালা ঝোপ ভূতের মত সাম্‌নে এসে সরে যাচ্ছে
বুনো জন্তুর মত ভয় পেয়ে ছুটে চলেছে ট্রেন।
হঠাৎ তোমার মুখখানি সূর্য্যের সোনা মাখানো
জলে উঠ্‌লো ভীরু প্রদীপশিখার মত
যেন দূরে ফেলে আসা রাতের স্টেশনের আলো।
তুমি দাঁড়িয়ে আছ জরিষ্ণু রূপায়নে।
মহাকাল থম্‌কে আছে ক্ষণিক স্তব্ধতায়।

যযাতি

বিষ্ণু দে

অনেক পাপের পরম তাপের বিষম বোঝা
অনেক দিনের অনেক জ্ঞানের চরম ক্ষতি
অনিকেত মনে যক্ষের কূট প্রশ্ন আনে।
তাইত কাতরে ব্যাধভয়াহত পাহাড় খোঁজা
পাতালপুরীর আঁধারে তাইত প্রণয়রতি
নাটকীয়স্বরে যযাতিশিরার প্রবল গানে।

বসুন্ধরার অগ্নিউদরে লেগেছে দোলা
শতসর্পিল ধূমকেতু তার অন্ত্র টানে
মরণ আহরি' আহারে বিবশ দিবসনিশা
উপবাসোগ্র ধমনীশিরার প্রবল তৃষা
নিদ্রাহীনের রজনীতে তাই পরম ভোলা
নাটকীয়স্বরে যযাতিশিরার প্রবল গানে।

সন্ধ্যামণির সোনার খনিতে আগুন লাগে
আকাশগঙ্গা হল পিঙ্গল বালুকা জালা
শনির কণিকা দৈবআখরে জীবনে হানে
মরণের ছায়া, করকোষ্ঠীর ছিন্ন মালা।
তাইত হৃদয় নির্দ্দয়লোভে তোমারে মাগে
প্রায়মুমূর্ষু যযাতিশিরার প্রবল গানে।

মুখ

বুদ্ধদেব বসু

ঘোমটা টেনে দাও
ঘোমটা টেনে দাও তোমার মুখের উপর :
তোমার রূপ আমি সইতে পারিনে।

তোমার মুখ
নগ্ন, উৎসুক, সম্পূর্ণ-উদ্ভাসিত
যেখানে ঝলসাচ্ছে বিদ্যুৎ
যেখানে ডানা ঝাপটাচ্ছে অদৃশ্য পাখি, আগুনের ঢেউয়ের মত তার
ডানার ওঠা পড়া—
আমি তা কেমন ক'রে সইবো ?

তোমার কি ভয় করে না
ভয় করে না আমার কাছে এসে বসতে ?
ভয় করে না চোখ তুলে তাকাতে আমার দিকে ?
তোমার কি ভয় করে না যে আমি ম'রে যাবো ?
ঘোমটা টেনে দাও
ঘোমটা টেনে দাও তোমার মুখের উপর—
তোমার মুখ আমাকে মারছে।

এত মধুর তুমি, এমন নরম—তোমার হাত
বার-বার আমার হাতের মধ্যে মিশে যেতে চায়,
গ'লে যেতে চায় মোমের মত আগুনে ;
তোমার সমস্ত শরীরের সৌরভ আমাকে জড়িয়ে ধরে,
আমার সমস্ত আত্মাকে জড়িয়ে ধরে তোমার চুল,
আর তুমি—তোমার দুই চোখের উৎস থেকে
বাসনার তারাময় স্রোত আমার উপর ঝরিয়ে দিয়ে বলো—
মৃদুস্বরে, অর্দ্ধস্ফুট স্বরে, তোমার ঐ ভাঙা-ভাঙা নরম গলায়
শুধু বলো—'কী ?'

তুমি কি জানো সেই মুহূর্ত্তে আমি ম'রে যেতে পারতুম ?

তোমার মধুরতা, তোমার কোমলতা—
এর ভয়ঙ্কর ভার আমি সইবো কী ক'রে ?

দুঃখ দাও
দুঃখ দাও আমাকে—
এই নববর্ষার ছোট-ছোট বৃষ্টির মত
ধারালো দুঃখ আমার বুকের উপর নামুক :
যে-বৃষ্টিতে জাগে প্রাণের অঙ্কুর,
মাটি সবুজে হেসে ওঠে,
যে-বৃষ্টি জ্বালিয়ে দেয় আশ্চর্য্য রামধনু
আকাশের প্রান্ত থেকে প্রান্তে।

ঘোমটা টেনে দাও।

ব্রাউনিঙের অনুসরণে

বুদ্ধদেব বসু

এ-ঘর থেকে ও-ঘর
আমি তাকে খুঁজে বেড়াই :
হঠাৎ চমকে উঠি—
বুঝি ও-আয়নায় পড়লো তার ছায়া।
বুঝি বালিসে তার চুলের বাসি গন্ধ ;
বুঝি দেয়ালের বাঁকা রোদে তার খোঁপার আধখানা ছায়া ;
একটু আগে সে কি বসেছিলো এই সোফাটায়,
এইমাত্র উঠে গেলো, তার আঁচল
রান্নাঘরের দরজায় ঝিলকিয়ে উঠলো—
থেকে-থেকে চমকে উঠি।

এ-ঘর থেকে ও-ঘর
প্রেতের মত আমি ঘুরে বেড়াই ;
প্রেতে-পাওয়া এই বাড়ি বোবা হ'য়ে আছে
স্মৃতির ভয়ঙ্কর চাপে মূৰ্চ্ছিত।
আকাশে পূর্ব থেকে পশ্চিমে সূর্য্যের পরিক্রমণ
সময়কে আলোর করাত দিয়ে চিরে-চিরে যায়
এক-একটি মণিময় মুহূর্ত্তে
এক-একটি বাণীহীন প্রত্যাশায়।

নাম

বুদ্ধদেব বসু

দেয়ালে তোমার নাম লিখে গেছো
চুলের কাঁটা দিয়ে
ছোট দু' অক্ষর।

মনে-মনে বলি, ওদিকে তাকাবো না,
ও-পথে উন্মত্ততা।

বিছানায় শুয়ে রুগ্ন ক্লান্ত হাতে
কী খেয়ালে নিজের নাম লিখেছিলে
ঐখানে—দেয়ালের গায়ে।

বলো, এখন আমি কী ক'রে ঘুমোবো ?
এখন আমি তাকাবো কোনদিকে ?

শেষরাত্রে, ঘুম-ভাঙা চোখে
কতদিন আমরা দেখেছি
লাল-আলো-জ্বালা টালিগঞ্জের ট্রাম
অন্ধকার পার হ'য়ে আসছে।

ঐ তো সেই রাস্তার বাঁক, গাছের সারিতে আধো-লুকোনো,
এই তো সারাদিন ধ'রে ট্রামের গোঙানি
সারাদিন ধ'রে ট্র্যাফিকের অট্টরোল :
কিন্তু আমার
আমার মন নিঃশব্দ,
নিঃস্পন্দ,
দাঁতে-দাঁত-চাপা মূর্চ্ছায় নিশ্চেতন—
কেননা নিঃসাড় হ'তে যদি না পারি তাহ'লে উন্মত্ততা।

সেই যে তুমি লিখে গেছো
দেয়ালের গায়ে তোমার নাম,
ছোট দু' অক্ষর।

কার্ত্তিক

বুদ্ধদেব বসু

ঘুমে ভরা, বিষণ্ণ নিঃশ্বাসে ভরা নীরক্ত কার্ত্তিক।
নিশ্চল নিষ্প্রভ দিন, আকাশ পাণ্ডুর।
নিশ্চিত নিঃস্রোত বেলা, পৃথিবীতে পীত পাণ্ডুরোগ।
নিশ্চিত মৃত্যুর মত
আসন্ন শীতের বেলা
হামাগুড়ি দিয়ে চ'লে আসে ;
শূন্যদিনে শূন্যমনে শুয়ে-শুয়ে
সহরের বিমর্ষ গোঙানি শুনি,
কাক আর কুকুরের ডাক ;
সহরের মুমূর্ষু নিঃশ্বাস শুনি ;
কিরাত-কার্ত্তিকে কাক ডেকে-ডেকে
গৃহস্থের ঘরে-ঘরে নিয়ে এলো।
বিবর্ণ আকাশে
ওৎ পেতে চুপ ক'রে থাকে
সারাদিন ধূসর শ্বাপদ এক ;
সারারাত্রি ধূসর শ্বাপদ এক
হা-হা ক'রে চ'ষে-চ'রে ফেরে
আকাশের অনাকার অন্ধকারে।

সমাপ্তি

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

বরষাবিষণ্ণ বেলা কাটালাম উন্মন আবেশে।
উদ্‌ঘাটিয়া জনশূন্য হৃদয়ের দ্বার
স্মরণের চলাচল করিলাম সহজ সরল।
দৃষ্টিহারা নেত্রপাতে দেখিলাম সন্নত আকাশে
এইমতো আর এক দিবসের ছবি।
অবিশ্রান্ত বৃষ্টির বিলাপে
শুনিলাম সে-কণ্ঠের স্নেহসম্ভাষণ।
অর্গলিত বাতায়নে ঝটিকার নিরর্থ আক্রোশে
বিচ্ছেদবিধ্বস্ত হিয়া বাথানিলো ক্ষুব্ধ অক্ষমতা
নির্ব্বিকার নিরুত্তর রুক্ষ বিধাতারে॥

এলো সন্ধ্যা রিক্তবরিষণ ;
দিনান্তের মুমূর্ষু বর্ত্তিকা
ক্ষণিকের অরুন্তুদ কৃত্রিম রুচিতে
প্রাণের অন্তিম শক্তি অকাতরে দিলো নিঃশেষিয়া ;
তারপরে অন্তরে বাহিরে
অন্ধকার বিস্তারিলো শবপ্রাবরণী॥

মনে হলো আশা নাই,
মনে হলো ভাষা নাই পিঞ্জরিত ব্যর্থতা বলার।
মনে হলো
সঙ্কুচিত হয়ে আসে মরণের চক্রব্যূহ যেন।
মনে হলো রন্ধ্রচারী মূষিকের মতো
শটিত জঞ্জালকণা কুড়ায়েছি এত কাল ধ'রে
কৃপণের ভাণ্ডারে ভাণ্ডারে ;
এইবার ফুরায়েছে পালা,
ঘাতক যন্ত্রের কারা অবরুদ্ধ হলো অবশেষে ;
এইবার উত্তোলিত সম্মার্জনীমূলে
পিষ্ট হবে অচিরাৎ অকিঞ্চন উঞ্ছবৃত্তি মম ॥

হাউই

স্মৃতিশেখর উপাধ্যায়

হাউইটা বারুদে ভরাট।
সাহস ক'রে কেউ তার মুখে আগুন দিতে পারে না।
তুমি বেপরোয়া,
আঁচোলটা কোমরে জড়িয়ে
বাঁ হাতে সেটা আল্‌গোচে ধরলে,
ডান হাতে দীপটি একবার ছুঁয়ে দিলে তার মুখে।
হুস্ ক'রে হাউই নিমেষে উড়ল আকাশে,
আঁধারের কষ্টিপাথরের উপর
একটা সোনার রেখা টেনে দিয়ে,
পড়ল ঝ'রে হাজার তারায়।
তার পাকাটির দেহটা কোথায় গিয়ে পড়ল কে জানে!

এই তুমি হচ্চ সেই তুমি,
যে আমাকে একটা থধূপের মত উড়িয়ে দিল আকাশে।
দিয়েছিলে একটি মাত্র চুম্বন,
ঠিক ওই আগুনের স্ফুলিঙ্গের মত সলিতার মুখে।
তোমার কাছ থেকে সেই আমার বিদায় অভিসার
ঊর্দ্ধলোকে, বহ্নিসরণি ধ'রে।
হাজার তারায় ঝরতে ঝরতে ছুটে চলেছি,
ওই ত আমার কবিতার পর কবিতা তোমার উদ্দেশে।

আমার দেহ? সেই পাকাটিটা?
কোথায় প'ড়ে আছে কে জানে!
কে-ই বা তুমি, কোথায় বা আছ,
সে সংবাদে আমার প্রয়োজন কি?
তোমাকে প্রণাম, আমাকে মুক্তি দিয়েছ সুরের ভুবনে।

প্রশ্নের উত্তর

প্রভু গুহঠাকুরতা

জীবন-রহস্য নিয়ে
ঘাঁটাঘাঁটি, কথা-কাটাকাটি অনেক হয়েচে।
যে শূন্য, যার শেষ নেই
তারই খবর পাবে ব'লে
মরণ-পথের যাত্রীদল তবু
ভিড় করেচে আসা-যাওয়ার সঙ্গমে।

কেমন ক'রে আসা গেল,
কখন চ'লে যাওয়া হবে,
কেন বেঁচে থাকা, কেন পথ-চলা,
কেন ভালোবাসা—
এ সব ভাবনা আসে।
তত্ত্বজ্ঞানী বলে :
তুমি-আমি
পরমাত্মার টুক্‌রো কিনা তাই।

বায়লজিস্ট্ বলে :
আমার এই প্রাণমন, অন্তর বাহির,
অস্থির খোলসটা,
হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনধ্বনি,

আমার ওই সূক্ষ্ম রসবোধ,
শরীরের যত দরকার,
রূপের পিপাসা, আর ভালোবাসার প্রচুর উৎপীড়ন—
সবই নাকি
খণ্ড-খণ্ড রূপে আছে
গোড়াকার প্রোটোপ্লাজ্‌মের অদেহী বিন্দুতে।
আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের মতে
সব জন্মকারণের, সব প্রশ্ন আরম্ভের
আসল সংবাদই ঐ।

এ যুগের মনের দুয়ার খুলে দিল
হেকেল, ইয়ুং, ব্যর্টেণ্ড্ রাসেল্,
মারি স্টোপ্‌স্ আর হ্যাভ্‌লক্ এলিস্।
মন্থর ইভোল্যুশনের থিয়োরি ছিল
নিতান্তই মনগড়া;
অমৃতের যে-সন্ধান
বেদান্ত করেছিল প্রচার
সে পথ হারিয়ে গেছে পথের বালিতে।

মিছে কেন জীবনের সূত্রগুলি মিথ্যায় জড়াবো?
কে না জানে
নারঙ্গি ফলের কোয়াগুলির মতো
জীবনের বীজবিন্দু

পরতে পরতে
জন্ম-সূচনার গায়ে গায়ে
গোড়া হ'তে লেগে ছিল।

সেইজন্য, সবই আজ চোখে পড়চে ধরা,
মায়া নয়, ছলনাও সে হ'তে পারে না ;
প্রোটোজুয়াগুলি কিল্‌বিল্‌ করতে থাকে
একখণ্ড কাচের উপরে
যখনই চোখে মাইক্রোস্‌কোপ লাগিয়ে দেখি।
দেহের মন্দির ভ'রে আছে মাইক্রোবে,
মাইক্রোব বাহন হয়েচে তার দেবতার ;
সব বৈজ্ঞানিকরা মিলে
ভালোবাসার গোপন কথাটি বুঝিয়ে দিয়েচে।

কেন ভালোবাসি ?
কেনই বা ভালোবাসা ফিরে পাই,
ফিরিয়ে দিই ?
আপ্‌-টু-ডেট্‌ ব্যাখ্যা আছে :
শরীরের কোনো-কোনো গ্ল্যান্‌ড্‌
স্নায়ু-তরঙ্গের উদ্দাম উচ্ছ্বাসে
যখন চঞ্চল হোয়ে ওঠে,
তখন ভালোবাসা জেগে ওঠে প্রাণে ;

শিরায়-শিরায় প্রেম-কোষগুলি ডাক দিয়ে বলে :
"জাগো, ভালোবাসা।"
জাগে ভালোবাসা।

নবীনপন্থীরা আজ
জীবনের দুই পার দখল করেচে ;
যে পার থেকে হৃদয়-নদী পাড়ি দেয়ার সঞ্চয়
করি জোগাড় ;
আর যে পারে গিয়ে চুকিয়ে ফেলতে চাই
পাওয়া-না-পাওয়ার সব হিসেবপত্র।

বিন্দু থেকে সুরু হয়েছিল যে দেহটা
তার বিন্দুবিসর্গও জানতে পারলাম না ;
যে আবেগগুলি শিরশিরিয়ে উঠেছিল
বার বার
অকারণ আনন্দে,
তার চলাচলের রাস্তাঘাট
চিনবার অবকাশ আর মিললোই না।

আরম্ভ হওয়ার কাহিনীটা
লেখা আছে যাদের নোটখাতায়,
সেটা তারাই পড়লো,
আমি পড়তে পেলাম না।

গদ্য-কাব্য

গদ্য-কাব্য নিয়ে সন্দিগ্ধ পাঠকের মনে তর্ক চলছে। এতে আশ্চর্য্যের বিষয় নেই।

ছন্দের মধ্যে যে বেগ আছে সেই বেগের অভিঘাতে রসগর্ভ বাক্য সহজে হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করে, মনকে দুলিয়ে তোলে—এ কথা স্বীকার করতে হবে।

শুধু তাই নয়। যে সংসারের ব্যবহারে গদ্য নানা বিভাগে নানা কাজে খেটে মরছে কাব্যের জগৎ তার থেকে পৃথক। পদ্যের ভাষা-বিশিষ্টতা এই কথাটাকে স্পষ্ট করে; স্পষ্ট হোলেই মনটা তাকে স্বক্ষেত্রে অভ্যর্থনা করবার জন্যে প্রস্তুত হোতে পারে। গেরুয়া বেশে সন্ন্যাসী জানান দেয় সে গৃহীর থেকে পৃথক, ভক্তের মন সেই মুহূর্ত্তেই তার পায়ের কাছে এগিয়ে আসে—নইলে সন্ন্যাসীর ভক্তির ব্যবসায়ে ক্ষতি হবার কথা।

কিন্তু বলা বাহুল্য সন্ন্যাসধর্ম্মের মুখ্য তত্ত্বটা তার গেরুয়া কাপড়ে নয় সেটা আছে তার সাধনার সত্যতায়। এই কথাটা যে বোঝে, গেরুয়া কাপড়ের অভাবেই তার মন আরো বেশি ক'রে আকৃষ্ট হয়। সে বলে আমার বোধশক্তির দ্বারাই সত্যকে চিনব, সেই গেরুয়া কাপড়ের দ্বারা নয় যে কাপড় বহু অসত্যকে চাপা দিয়ে রাখে।

ছন্দটাই যে ঐকান্তিকভাবে কাব্য তা নয়। কাব্যের মূল কথাটা আছে রসে, ছন্দটা এই রসের পরিচয় দেয় তার আনুষঙ্গিক হয়ে।

সহায়তা করে দুইদিক থেকে। এক হচ্চে স্বভাবতই তার দোলা দেবার শক্তি আছে, আর এক হচ্চে পাঠকের চিরাভ্যস্ত সংস্কার। এই সংস্কারের কথাটা ভাববার বিষয়। একদা নিয়মিত অংশে বিভক্ত ছন্দই সাধু কাব্যভাষায় একমাত্র পাংক্তেয় ব'লে গণ্য ছিল। সেই সময়ে আমাদের কানের অভ্যাসও ছিল তার অনুকূলে। তখন ছন্দে মিল রাখাও ছিল অপরিহার্য্য।

এমন সময়ে মধুসূদন বাংলাসাহিত্যে আমাদের সংস্কারের প্রতিকূলে আনলেন অমিত্রাক্ষর ছন্দ। তাতে রইল না মিল। তাতে লাইনের বেড়াগুলি সমানভাগে সাজানো বটে, কিন্তু ছন্দের পদক্ষেপ চলে ক্রমাগতই বেড়া ডিঙিয়ে। অর্থাৎ এর ভঙ্গী পদ্যের মতো কিন্তু ব্যবহার গদ্যের চালে।

সংস্কারের অনিত্যতার আর একটা প্রমাণ দিই। এক সময়ে কুলবধূর সংজ্ঞা ছিল, সে অন্তঃপুরচারিণী। প্রথম যে কুলস্ত্রীরা অন্তঃপুর থেকে অসঙ্কোচে বেরিয়ে এলেন তাঁরা সাধারণের সংস্কারকে আঘাত করাতে তাঁদেরকে সন্দেহের চোখে দেখা ও অপ্রকাশ্যে বা প্রকাশ্যে অপমানিত করা, প্রহসনের নায়িকারূপে তাঁদেরকে অট্টহাস্যের বিষয় করা প্রচলিত হয়ে এসেছিল। সেদিন যে মেয়েরা সাহস ক'রে বিশ্ববিদ্যালয়ে পুরুষ ছাত্রদের সঙ্গে একত্রে পাঠ নিতেন তাঁদের সম্বন্ধে কাপুরুষ আচরণের কথা জানা আছে।

ক্রমশই সংজ্ঞার পরিবর্ত্তন হয়ে আসছে। কুলস্ত্রীরা আজ অসংশয়িতভাবে কুলস্ত্রীই আছেন যদিও অন্তঃপুরের অবরোধ থেকে তাঁরা মুক্ত।

তেমনি অমিত্রাক্ষর ছন্দের মিলবর্জ্জিত অসমানতাকে কেউ কাব্যরীতির বিরোধী ব'লে আজ মনে করেন না। অথচ পূর্ব্বতন বিধানকে এই ছন্দ বহু দূরে লঙ্ঘন করে গেছে।

কাজটা সহজ হয়েছিল কেননা তখনকার ইংরেজিশেখা পাঠকেরা মিল্টন শেক্‌স্‌পিয়রের ছন্দকে শ্রদ্ধা করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

অমিত্রাক্ষর ছন্দকে জাতে তুলে নেবার প্রসঙ্গে সাহিত্যিক সনাতনীরা এই কথা বলবেন যে, যদিও এই ছন্দ চোদ্দ অক্ষরের গণ্ডিটা পেরিয়ে চলে তবু সে পয়ারের লয়টাকে অমান্য করে না।

অর্থাৎ লয়কে রক্ষা করার দ্বারা এই ছন্দ কাব্যের ধর্ম্ম রক্ষা করেছে, অমিত্রাক্ষর সম্বন্ধে এইটুকু বিশ্বাস লোকে আঁকড়ে রয়েছে। তারা বলতে চায় পয়ারের সঙ্গে এই নাড়ীর সম্বন্ধটুকু না থাকলে কাব্য কাব্যই হোতে পারে না। কী হোতে পারে এবং হোতে পারে না তা হওয়ার উপরেই নির্ভর করে, লোকের অভ্যাসের উপর করে না—এ কথাটা অমিত্রাক্ষর ছন্দই পূর্ব্বেই প্রমাণ করেছে। আজ গদ্য কাব্যের উপরে প্রমাণের ভার পড়েছে যে গদ্যেও কাব্যের সঞ্চরণ অসাধ্য নয়।

অশ্বারোহী সৈন্যও সৈন্য আবার পদাতিক সৈন্যও সৈন্য—কোন্‌খানে তাদের মূলগত মিল? যেখানে লড়াই ক'রে জেতাই তাদের উভয়েরই সাধনার লক্ষ্য।

কাব্যের লক্ষ্য হৃদয় জয় করা,—পদ্যের ঘোড়ায় চ'ড়েই হোক্ আর গদ্যে পা চালিয়েই হোক্। সেই উদ্দেশ্যসিদ্ধির সক্ষমতার দ্বারাই তাকে বিচার করতে

হবে। হার হোলেই হার, তা সে ঘোড়ায় চ'ড়েই হোক্ আর পায়ে হেঁটেই হোক্। ছন্দে লেখা রচনা কাব্য হয় নি তার হাজার প্রমাণ আছে, গদ্য রচনাও কাব্য নাম ধরলেও কাব্য হবে না তার ভূরি ভূরি প্রমাণ জুটতে থাকবে।

ছন্দের একটা সুবিধা এই যে ছন্দের স্বতই একটা মাধুর্য্য আছে, আর কিছু না হয় তো সেটাই একটা লাভ। সস্তা সন্দেশে ছানার অংশ নগণ্য হোতে পারে কিন্তু অন্তত চিনিটা পাওয়া যায়।

কিন্তু সহজে সন্তুষ্ট নয় এমন একগুঁয়ে মানুষ আছে, যারা চিনি দিয়ে আপনাকে ভোলাতে লজ্জা পায়। মনভোলানো মালমসলা বাদ দিয়েও, কেবলমাত্র খাঁটি মাল দিয়েই তারা জিতবে এমনতরো তাদের জিদ। তারা এই কথাই বলতে চায় আসল কাব্য জিনিষটা একান্তভাবে ছন্দ অছন্দ নিয়ে নয়, তার গৌরব তার আন্তরিক সার্থকতায়।

গদ্যই হোক্ পদ্যই হোক্ রসরচনামাত্রেই একটা স্বাভাবিক ছন্দ থাকে। পদ্যে সেটা সুপ্রত্যক্ষ; গদ্যে সেটা অন্তর্নিহিত। সেই নিগূঢ় ছন্দটিকে পীড়ন করলেই কাব্যকে আহত করা হয়। পদ্য-ছন্দবোধের চর্চ্চা বাঁধা নিয়মের পথে চলতে পারে কিন্তু গদ্য-ছন্দের পরিমাণবোধ মনের মধ্যে যদি সহজে না থাকে তবে অলঙ্কারশাস্ত্রের সাহায্যে এর দুর্গমতা পার হওয়া যায় না। অথচ অনেকেই মনে রাখেন না যে, যেহেতু গদ্য সহজ, সেই কারণেই গদ্যছন্দ সহজ নয়। সহজের প্রলোভনেই মারাত্মক বিপদ ঘটে, আপনি এসে পড়ে অসতর্কতা। অসতর্কতাই অপমান করে কলালক্ষ্মীকে, আর কলালক্ষ্মী তার শোধ তোলেন অকৃতার্থতা দিয়ে। অসতর্ক লেখকদের হাতে গদ্যকাব্য অবজ্ঞা ও পরিহাসের উপাদান স্তূপাকার ক'রে তুলবে এমন আশঙ্কার কারণ আছে। কিন্তু এই সহজ কথাটা বলতেই হবে যেটা যথার্থ কাব্য সেটা পদ্য হোলেও কাব্য গদ্য হোলেও কাব্য।

সবশেষে এই একটি কথা বলবার আছে:—কাব্য প্রাত্যহিক সংসারের অপরিমার্জ্জিত বাস্তবতা থেকে যত দূরে ছিল এখন তা নেই। এখন সমস্তকেই সে আপন রসলোকে উত্তীর্ণ করতে চায়—এখন সে স্বর্গারোহণ করবার সময়েও সঙ্গের কুকুরটিকে ছাড়ে না।

বাস্তব জগৎ ও রসের জগতের সমন্বয়সাধনে গদ্য কাজে লাগবে; কেননা গদ্য শুচিবায়ুগ্রস্ত নয়।

১২।১১।৩৬

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সম্পাদক : বুদ্ধদেব বসু : প্রেমেন্দ্র মিত্র : সহকারী সম্পাদক : সমর সেন ;
৫ ও ৬ চিন্তামণি দাস লেন শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস হইতে প্রভাতচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কবিতা

দ্বিতীয় বর্ষ চৈত্র, ১৩৪৩ তৃতীয় সংখ্যা

ইকনমিক্স

বুদ্ধদেব বসু

বক্ষে যখন দিচ্ছে হানা
অন্নাভাবের দুঃখ,
তখনো কি স্বভাবখানা
নেইকো হ'তে রুক্ষ?
পিষ্ট হলেম সুবুদ্ধি ও
দুষ্ট ইকনমিক্সে,
ভব্যতাতেও অদ্বিতীয়—
নয় কি খানিক কমিক সে?
ইঁদুরটাও তো হাত-পা ছোঁড়ে
বাক্সে মরতে-মরতে,
ভদ্রভাবে আমরা প'ড়ে
ইকনমিক গর্ত্তে।
অপমৃত্যুর তলায় পাতা
কত মস্ত থিওরি,
মূঢ় ইঁদুর ভাবলে না তা
দেখে আমরা শিহরি।

মনোবৃত্তি অতিরিক্ত
শিক্ষিত ও সূক্ষ্ম,
চক্ষু হ'লেও অশ্রুসিক্ত
মেজাজ হয় না রুক্ষ।
কাল্‌চারের চূড়ায় ব'সে
রাগ করতেও জাত যায়,
ঈর্ষা যদি হঠাৎ ফোঁসে
ম'রেই যাবো লজ্জায়।
অর্থনীতির শাস্ত্রমতেই
ঘটছে যে এই কাণ্ডটা
সে-কথাটা বুঝবে না এই
মগজ-ভরা মুণ্ডটা!
উদরটা তুই অতি ইতর
তলার দিকে আকর্ষণ,
ভাঙবি এমন সাধ্য কি তোর
শালীনতার আদর্শন!
হায়রে কবি হায়রে,
অতি উচ্চ কাব্যচর্চা
তাতেও কিছু অর্থখরচা,
ভিতরটাতে হা-হা করুক,
হাসতে হবেই বাইরে।

যদি এ-সব সভ্যবাণী
লাগে ঈষৎ বিদ্‌ঘুটে,
ধ্বংস করো, মক্ষিরানি,
কটাক্ষের বিদ্যুতে।
মক্ষিরানি, চক্ষে তোমার
অশিক্ষিত মুক্তি,
প্রজ্বলিত কল্পনার
অসংযত ফূর্ত্তি।
বিশ্বজয়ী দস্যুতার
দুঃসাহসী বণিক সে,
দেয়নি ধরা বৈশ্যতার
ক্ষুদ্র ইকনমিক্সে।
মক্ষিরানি, মুক্ত করো
যৌবনের বন্যাজল,
মগ্ন হোক্ সূক্ষ্মতরো
সুবুদ্ধির সৈন্যদল।
নিয়ম মেনে বিশ্ব চলে
বিধাতাও তো গণিতকার,
তোমার চোখে আগুন জ্বলে
ধন্য মোহ ক্ষণিক তাঁর।

সুখদুঃখ তুচ্ছ অতি,
সবই হচ্ছে সিস্‌টেমে,
তাই পৃথিবীর অগ্রগতি
চলছে পুরো ইষ্টিমে।
তুমি রঙিন সাড়ি পরো
রক্ষে আছে কি ওরই ?
তার মধ্যেও মস্ত বড়ো
ইকনমিক থিওরি।
মক্ষিরানি, শুধু তোমার
চক্ষে জ্বলে মুক্তি,
যৌবনের বন্যতার
অসম্ভবের ফুর্তি।
এই তো রানি, এই তো !
চোখের চাপা উৎস খোলো,
বিদ্যুতের ঝলক তোলো—
অঙ্ক যতই হোক্ না অন্ধ
কোনো শঙ্কা নেই তো।

গুহার গান

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মৈত্র

প্রভু !
তোমার মাথায় পড়ে স্বচ্ছ শুভ্র রাতের কণিকা।
তোমাকে রয়েছে ঘিরে আঁধারের নীরব আলোক।
আমি আছি অতল গুহায়।
বুকের উপর চেপে রয়েছে অজ্ঞতা
গভীর সে রাত,
স্তূপীকৃত পাহাড়ের সমাধির মত।
আমি যেন শুনতে পাই আমার এ সমাহিতি হতে
নরম রাতের চূর্ণ বিন্দু-বিন্দু ঝরে,
কালো আঙুরের মত গুচ্ছ-গুচ্ছ
তোমার ও-চুলে।

প্রভু !
তোমার বিশাল হাত আমাকে ফিরেছে খুঁজে, জানি,
শিকারী হাতের ছায়া কেঁদে গেছে দেহের উপর।
আমার বুকের রক্ত হয় নাই এখনো ত হিম।
এক বিন্দু উষ্ণতায় যদি জ্বলে জীবন আমার,
এক বিন্দু চোখের আভায়
এ বন্ধন বন্ধুই আমার।

প্রভু,

তোমার মাথার 'পরে অর্ঘ্য পড়ে
অনাদি রাতের।
তার ঘন সুরভির ঝড়
আমার অসাড় দ্বারে করে করাঘাত
চ'লে যায় গ্রহলোক পানে।
আমি থাকি প'ড়ে অসহায়।
পক্ষাঘাত দুর্ভেদ্য প্রহরী।
তোমার কুঠারে চূর্ণ ক'রে দাও মোরে।
দুহাতে ছড়িয়ে দাও রাতের আকাশে।
আমার এ গুহাকাশে বজ্র হানো, প্রভু
দগ্ধ হোক আমার এ শব।

জাতক

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মৈত্র

বহুদিন আগে,
যখন মানুষ ছিল জেলিমাছ,
আর, গাছপালাগুলো
ছিল সহুরে লোক—
(তুমি বিশ্বাস করবে না)
তখন কুমারী আকাশটার কথা
ভেবে দেখেছো ?
ইন্দ্রধনুর বর্ণ ছিল
সারা আকাশটার গায়ে,—
ভিজে রং—,
তারাদের দল ছিল পাখী ;
তাদের ডানায় এখনও তাই কত রং !
আজ তারা মর্ত্ত্যে নেমেছে।
আর, তাদের পুরোনো ইচ্ছাগুলো
টুক্‌রো টুক্‌রো হ'য়ে ছড়িয়ে প'ড়ে
জ্বলছে উপরে।

তখন তুমিও ছিলে না,
আমিও ছিলাম না, সুরমা,
আকাশের মুখ চেয়ে।
আজ মানুষ পালিয়ে এসেছে,
আমিও এসেছি
জেলিমাছের যুগ থেকে
হাজার হাজার বছরের পথ বেয়ে,
সমুদ্রের তলে অন্ধকার শ্যাওলা-ঢাকা পথ,
কাঁকরের রাস্তা,
পাথরের রাস্তা,
ইঁটের রাস্তা
আর পিচের রাস্তা বেয়ে,
তোমার কাছে।
তোমার বাগানের এক কোনে
ছোট্ট ছাতিম গাছ,
গন্ধে উঠেছে ভ'রে।
আর দেখেছি
গোল্ড মোহরের ফুলগুলি সোনা ছড়ায়
রোজ সকালে
রোদ্দুরের আঙুল দিয়ে।

যুঁই ফুলের ঝাড়গুলোর নিচে
মরা ফুলের স্তূপ,
সুগন্ধী বরফের মত জ'মে রয়েছে।
এই বাগানে বাসা বেঁধেছি, সুরমা

আমার সেই পুরোনো, জেলিমাছের আত্মাকে ঘিরে
গ'ড়ে উঠেছে দেহ
শিরা উপশিরায় ঢাকা,
যেমন গ'ড়ে ওঠে প্রাচীন ভগ্নস্তূপের উপর
উইয়ের ঢিপি।
তোমার বেণী লতিয়ে নামে জান্‌লা বেয়ে
দেখ্‌তে পাই,
আর তোমার বেণীর সর্পিল ডগাগুলোর
উদ্যত আগ্রহে
আমার বুকের রক্ত জমাট বাঁধে;
আর তাই জানলার নিচে,
অশথের চারাটকে খুন্ করতে ইচ্ছে করে।

সন্ধ্যার সময়
যখন আকাশের মুখ,
হ'য়ে ওঠে ঘুঘুর বুকের মত
নরম আর গোলাপি,
তখন তার দিকে চেয়ে চেয়ে
কোন্ রূপকথাকে খুঁজে বেড়াও জানি না।
—দেখছি আকাশকে ভোলো নি !

শুনে হয়ত হাসবে,—
তোমার চোখের স্পর্শ-লাগা আকাশ,
গুঁড়ি মেরে ঢুকেছে
আমার বুকে।
হৃদ্‌পিণ্ড ছড়াচ্ছে নীল রক্ত।
ছাতের আল্‌সে থেকে,
তুমি দেখ, কালো পিচের রাস্তা দিয়ে
লাল রক্তলোলুপ বাস্‌গুলো ছুটছে ;
দূরে, জাহাজের হুইস্লে,
হরিণীর মত ওঠো চম্‌কে।
আর আমি খুঁজে ফিরছি
ফাটলগুলো
তোমার বাড়ির আনাচে কানাচে।

সনেট

("When by thy scorn, O' murd'ress, I am dead"—)

Donne

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মৈত্র

বৈশাখের দাবদাহ ভ'রে নিলে চোখে,
স্পর্শ-ভিক্ষু পাদপেরা পুড়ে হল খাক্।
কামনার সৌধচূড়া প্রলয় আলোকে
মুমূর্ষু ও শোকাতুর। আজ ঝ'রে যাক্
বিয়াত্রিচে সুভদ্রার স্বপন-কুসুম।
যৌবনের মন্ত্রমুগ্ধ দ্রাক্ষারস ভুলি'
দেহ ভরি' পান করি মৃত্যু-নীল ঘুম।
কবরীর মেঘ হতে বজ্র লহো তুলি'
হানো এই তপোদগ্ধ শীর্ণতার বুকে,
নিষ্ঠুর ঘূর্নির পায়ে ভস্ম যাক্ উড়ে।
প্রেতের দুরূহ পথে নেমে যাবে সুখে
গহন পাতালে। তবু ছায়াপথ ঘুরে
পাঠাবো বেদনা রাত্রে তোমার শিয়রে,
দুঃস্বপ্নের খড়্গ যাবো রাখি বক্ষ 'পরে।

ডি, এইচ্ লরেন্সের
কয়েকটি অনুবাদ

বিষ্ণু দে

১

গম্ভীর স্থির পাহাড়ের সামনে অস্পষ্ট ইন্দ্রধনুর ফিতে,
তার আর আমাদের মধ্যে বজ্রের যাওয়া-আসা।
নিচে সবুজ ক্ষেতে মজুররা দাঁড়িয়ে
কালো থামের মতো, সবুজ যবের ক্ষেতে নিশ্চল।

তুমি আমার পাশে, তোমার খালি পায়ে স্যাণ্ডাল্
বারাণ্ডার কাঁচা কাঠের গন্ধের মধ্যে দিয়ে ভাসছে
তোমার চুলের গন্ধ আমার কাছে :
ঐ আসছে
আকাশ থেকে পড়ল এসে বিদ্যুৎ।

ক্ষীণ সবুজ বরফগলা নদীতে কালো নৌকো
অন্ধকার কেটে-কেটে—যায় কোথায় ?
বজ্র হেঁকে ওঠে। কিন্তু আমরা তো এখনো
পরস্পরের।
উলঙ্গ বিদ্যুৎ আকাশে কেঁপে-কেঁপে চলে' যায়।
—আমরা ছাড়া আর কিই বা আছে আমাদের ?
নৌকোটা গেলো চলে'।

২

বাংলোয় নীরবতা, রাত্রি গভীর, আমি একা
বারাণ্ডায়
শোনা যায় তিস্তার আর্ত্তনাদ, দেখা
যায় সাদা নদীটির ভাঙা হাড় প্রেতচ্ছায়ায়
পাইনের ফাঁকে-ফাঁকে, পাথরের আকাশের পায়ে।
থেকে-থেকে গোটাকয় জোনাকপোকার অস্পষ্ট অসাড়
শূন্যে মিশে যাওয়া।
ভাবি শুধু কোথা নিশি-পাওয়া
সর্ব্বস্বান্ত বিলুপ্তির অন্ধকারে আমার নিস্তার ?

৩

না, না, এই রৌদ্র এবারে থেমে যাক্
চুনকামে ঝক্‌ঝকে বাড়িগুলো আর বারাণ্ডার টক্‌টকে ফুলগুলো
আর দূরের ঐ নীলিম পাহাড়গুলো পিষে যাক্
অন্ধকারের ছুটো পেশীপিণ্ডের চাপে।
অন্ধকার উঠছে, অন্ধকার পড়ছে, তার চাপা আওয়াজে
সর্ব্বস্ব মুছে দিয়ে-দিয়ে।

আলোর দেয়ালের ভিৎ ধ্বসে' যাক্, খসে' যাক্
আর অন্ধকারের পাথরগুলো হুড়মুড় করে' নেমে আসুক
আর সব চিরকালের মতো হ'য়ে যাক্ ঘন কালো অন্ধকার।
ঘুম নয়, স্বপ্নে ধূসর সে ঘুম,
মৃত্যুও নয়, নবজন্মের সম্ভাবনায় সে স্পন্দমান,
শুধু ভারি, বিশ্ব-ডোবানো অন্ধকার, নিস্তব্ধ, নিশ্চল।

ঘুম ? ঘুমে কি হবে ?
পাহাড়ের উপর চল্‌তি মেঘের ছায়া, আমার উপর ভেসে যায়,
সে আমায় বদ্‌লায় না, দেয় না কিছুই।
আর মৃত্যুও নিশ্চয়ই বাকি রেখে যাবে একটু বেদনা,
সেও ত বীজকম্প্র, অস্থির।
একেবারে অন্ধকার হোক্ সব অন্ধকার
আমার ভিতরে, আমার বাইরে একেবারে
ঘন ভারি অন্ধকার।

৪

আমাদের দিন হলো গত,
রাত্রি উঠে আসে ঐ।

পৃথিবীর গর্ভ ছেড়ে চুপিসারে উঠে আসে
আঁধার ছায়ারা
আঁধার ছায়ারা
ধুয়ে দিয়ে যায় আমাদের হাঁটু
ভিজিয়ে দিয়ে ছিটিয়ে দিয়ে আমাদের উরু।
আমাদের দিন হলো শেষ।
কাদা ভেঙে ঠেলে-ঠেলে আমরা চলি
পাথরের ফাঁকে-ফাঁকে টলতে-টলতে পড়তে-পড়তে চলি।
ডুবলুম আমরা।
আমাদের দিন হলো গত
রাত্রি উঠে আসে ঐ।

৫

লেডা

এসো নাকো বহিয়া চুম্বন
দুই বাহু ওষ্ঠাধরে গাঢ় আলিঙ্গন
বহিয়া অস্ফুটস্বর মধুর গুঞ্জনে
এসো তুমি পক্ষ-বিধুননে
সমুদ্রের হর্ষ বহি চঞ্চুর আস্বাদে
এসো তুমি তরঙ্গ-সঞ্চারী
সিক্ত তব তন্তুপদপাতে
জলাভূমি-সুকোমল উদরে আমার।

৬

আনো বিপ্লব বিদ্রোহ কেউ ভাই
অর্থভাগের অনর্থে নয়
অর্থলোপের একান্ত দুরাশায়।
আনো বিপ্লব যাহোক্ একটা ভাই
শ্রমিকের নব-অভিষেক চেয়ে নয়
শ্রমিকের পাট একেবারে তুলে দিতে
আর রচনা করতে শুধু
মানুষেরই নব সূর্য্যখচিত দেশ।

৭

কবে তুমি শেখাবে তোমার জনগণকে
অমোঘ ন্যায়ের হে অমর দেবতা! নিজেদের উদ্ধার নিজেরাই করতে?
কতবার ত তারা উদ্ধৃত হল
কতবার উপজীবিত।

অমোঘ ন্যায়ের হে অমরদেবতা! পাঠিও না আর
জনগণ-উদ্ধারের অবতার।
একদা এক অবতার এলেন, করলেন উদ্ধার।

তারা দেখলে যে তারা তাঁর অমৃতপিতার কাছে হয়ে গেছে
বন্ধকী তমশুক।
তারা বললে, উদ্ধার ত করলে প্রভু
এদিকে যে উপবাস।
তিনি বলেন, ভালোই ত রে,
ওদিকে ততই ঘনিয়ে আসছে
আমার পিতার উনপঞ্চাশমহলা প্রাসাদে তোদের
কল্পপায়সান্নের ভোজ।
তারা বলে, প্রভু একটু মোটা শাকান্নও যদি—
তিনি বলেন, ছিছি
কোথায় সেই বৈকুণ্ঠের পায়সান্ন খাওয়া
আর তোরা চাস্ কিনা—

তারপরে ধরো নেপোলিয়ন
বলেন, আমি ত তোমাদের খালাস করলুম
অতীত আমলের আমুলমামুল ইজারা থেকে।
তোমরা হস্তান্তরে আজকে আমার,
প্রস্তুত করো জীবনমরণ তোমাদের
আমারই তরফে।

হয়তো তারপরে আসেন গণতান্ত্রিকদল,
বলেন, তোমাদের উদ্ধার হল আজ,
তোমরা আমাদের উদ্ধত উদ্বৃত্ত পুঁজি
এবারে কলকারখানায় আর বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী।

তারপরে লেনিন হয়তো বা,
বলেন, তোমাদের উদ্ধার সমাধা হল
একেবারে পাইকারি উদ্ধার।
তোমরা আর মানুষ নয়, সেটা বড় বুর্জোয়া
তোমরা সোভিএট রাষ্ট্রই একমাত্র হিসাবনিকাশ, মনে রেখো
তোমরা সব সে হিসাবে এক এক দফা শুধু,
দফায় দফায় কিছু আসে যায় না।
এই ত চলেছে চিরকাল, লোক উদ্ধারের পেশা
হে ন্যায়ের দেবতা, কবে এদের শেখাবে
আত্মউদ্ধার?

নির্জন অলস মধ্যাহ্নের সুর

হেমচন্দ্র বাগচী

মধ্যাহ্নের অলস সুর।
ঘন সন্নিবিষ্ট পাতার উপর এসে পড়েছে
প্রদীপ্ত রৌদ্র।
বনতলে আলোছায়ার খেলা
শ্যামল দূর্বার উপরে লাখ কীটপতঙ্গের মেলা।
একটা হল্‌দে রঙের পাখী
পত্রবহুল কাঁঠাল গাছের ঘনতার মধ্য থেকে ডাকছে ক্রমাগত
চোখ্ গেল চোখ্ গেল।
তার সেই সুর ধীরে ধীরে উচ্চ থেকে উচ্চতর হ'য়ে উঠছে—
নির্জন অলস মধ্যাহ্নের সুর

সাধ যায় অসুস্থ শরীর ও মন নিয়ে
ঐ শ্যামল দূর্বার উপরে প'ড়ে থাকি কিছুকাল—
শ্যামল দূর্বার স্নিগ্ধ স্পর্শ
আর বনের স্নেহশীতল মর্মরধ্বনি।

চেয়ে চেয়ে দেখি—
নেবুর ফুল এখনো ধরে নি।
নেবুফুলের গন্ধের সঙ্গে আসে
অনাদিকালের বিরহরাগিণী।
নির্জন অলস মধ্যাহ্নের সুর।

চেয়ে চেয়ে দেখি—
পশুমিথুনের লীলাবিলাস—
তাদের বলশালী কণ্ঠের তীব্রধ্বনি।
আর পুচ্ছের দ্রুত আন্দোলন,
বনতলের আধ আলো আধ ছায়ার মধ্যে
তাদের মূর্তিগুলির সুস্পষ্ট রেখা,
সজল আয়ত চক্ষু,
ভঙ্গীতে জীবনের পরিচয়।

সাধ যায় দেখি
এই জীবনের চিত্র,
চোখের উপরে একটি বিস্মৃত যুগের ছায়া ঘনায়—
তপোবন,

আলবালে জলসেচন,
মিলনকাতর দুষ্মন্তের বিলাপধ্বনি,
অতিপিনদ্ধস্তনী ঋষিকন্যাদের যৌবন-বেদনা।

আর দেখি,
মর্মরিত দেবদারুবনচ্ছায়ে
আয়তচক্ষু কৃষ্ণসারমৃগের করুণ প্রেম নিবেদন।
স্বপ্ন ভেঙে যায়,
দেখি, সে দিন শেষ হয়েছে—
এখন শুধু অনবসরের কাহিনী।

প্রেম? সময় নাই।
দয়া? সময় নাই।
ক্ষমা? সময় নাই।
হরিণীদের আয়তচক্ষুর বিভ্রম
বেদনায় নিপীড়িত হ'য়ে ওঠে।

* * *

অনেকদিন ধ'রে একটি পাখী
ক্রমাগত ডাকছে—

পত্রবহুল কাঁঠালগাছের মধ্য থেকে
চোখ্‌ গেল চোখ্‌ গেল—
তার ডাক শুনি
আর চেয়ে চেয়ে দেখি
ঘনসন্নিবিষ্ট পাতার উপরে এসে পড়েছে
প্রদীপ্ত রৌদ্র।
মধ্যাহ্নের জলতরঙ্গ বাজছে
তারি অলস ক্লিষ্টস্থর ভেসে আসছে
নারিকলপত্রের উদাস মির্মিরধ্বনিতে—
নির্জন অলস মধ্যাহ্নের স্থর।

শ্রাবণরাত

জীবনানন্দ দাশ

শ্রাবণের গভীর অন্ধকার রাতে
ধীরে ধীরে ঘুম ভেঙে যায়
কোথায় দূরে বঙ্গোপসাগরের শব্দ শুনে ?

বর্ষণ অনেকক্ষণ হয় থেমে গেছে ;
যতদূর চোখ যায় কালো আকাশ
মাটির শেষ তরঙ্গকে কোলে ক'রে চুপ ক'রে রয়েছে যেন ;
নিস্তব্ধ হয়ে দূর উপসাগরের ধ্বনি শুনছে।

মনে হয়
কারা যেন বড় বড় কপাট খুলছে,
বন্ধ ক'রে ফেলেছে আবার ;
কোন দূর—নীরব—আকাশরেখার সীমানায়।

বালিশে মাথা রেখে যারা ঘুমিয়ে আছে
তারা ঘুমিয়ে থাকে :
কাল ভোরে জাগবার জন্য।

যে সব ধূসর হাসি, গল্প, প্রেম, মুখরেখা
পৃথিবীর পাথরে কঙ্কালে অন্ধকারে মিশেছিল
ধীরে ধীরে জেগে ওঠে তারা ;
পৃথিবীর অবিচলিত পঞ্জর থেকে খসিয়ে আমাকে খুঁজে বার করে।

সমস্ত বঙ্গসাগরের উচ্ছ্বাস থেমে যায় যেন ;
মাইলের পর মাইল মৃত্তিকা নীরব হয়ে থাকে।

কে যেন বলে :
আমি যদি সেই সব কপাট স্পর্শ করতে পারতাম
তাহ'লে এইরকম গভীর নিস্তব্ধ রাতে স্পর্শ করতাম গিয়ে।—
আমার কাঁধের উপর ঝাপসা হাত রেখে ধীরে ধীরে আমাকে জাগিয়ে দিয়ে।

চোখ তুলে আমি
দুই স্তর অন্ধকারের ভিতর ধূসর মেঘের মত প্রবেশ করলাম :
সেই মুখের ভিতর প্রবেশ করলাম।

বিড়াল

জীবনানন্দ দাশ

সারাদিন একটা বিড়ালের সঙ্গে ঘুরে ফিরে কেবলই আমার দেখা হয় :
গাছের ছায়ায়, রোদের ভিতরে, বাদামী পাতার ভিড়ে ;
কোথাও কয়েক টুকরো মাছের কাঁটার সফলতার পর
তারপর শাদা মাটির কঙ্কালের ভিতর
নিজের হৃদয়কে নিয়ে মৌমাছির মত নিমগ্ন হয়ে আছে দেখি ;
কিন্তু তবুও তারপর কৃষ্ণচূড়ার গায়ে নখ আঁচড়াচ্ছে,
সারাদিন সূর্য্যের পিছনে পিছনে চলছে সে।
একবার তাকে দেখা যায়,
একবার হারিয়ে যায় কোথায়।
হেমন্তের সন্ধ্যায় জাফরান-রঙের সূর্য্যের নরম শরীরে
শাদা থাবা বুলিয়ে বুলিয়ে খেলা করতে দেখলাম তাকে ;
তারপর অন্ধকারকে ছোট ছোট বলের মত থাবা দিয়ে লুফে আনল সে,
সমস্ত পৃথিবীর ভিতর ছড়িয়ে দিল।

অকৃতজ্ঞ

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

আমার মৃত্যুর দিনে কৌতূহলী প্রশ্ন করে যদি—
সাধিলাম কী সুকৃতি, হবো যার প্রসাদে অমর ?
মেনে নিও মুক্ত কণ্ঠে, নেই মোর পাপের অবধি ;
সারা ইতিহাস খুঁজে মিলিবে না হেন স্বার্থপর ॥

অজস্র ঐশ্বর্য্য মোরে অর্পিয়াছে সমুদার বিধি ;
ভুঞ্জেছি নিষ্কুণ্ঠ মনে সে-সকলি প্রাপ্য ভেবে আমি ।
পেয়েছি অমিত সুধা আমন্ত্রিয়া কালের বারিধি ;
করেছি তা আত্মসাৎ, শুধু বিষ কণ্ঠে গেছে থামি ॥

দেখেছি এ-মরচক্ষে নটরাজ মহাশূন্যে নাচে,
শুনেছি পার্থিব কানে সে-নক্ষত্রনূপুরের ধ্বনি ;
তথাপি আমার বীণা বাজায়েছে বেসুর পিশাচে,
অধরার অনুনাদে সাড়া কভু দেয় নি ধমনী ॥

ফাল্গুন অঙ্গনে মোর ছড়ায়েছে অশোক পলাশ ।
দক্ষিণের বাতায়নে কৃষ্ণচূড়া হেনেছে বৈশাখ ।
জাগায়ে মেদুর মেঘে চপলার চকিত বিলাস
বিকচ কদম্বকুঞ্জে আষাঢ় দিয়েছে মোরে ডাক ॥

শেফালীরঞ্জিত হস্তে নবান্নের নৈবেদ্য এনেছে
অতিক্রমি কাশবন সিতাম্বর শ্যামল আশ্বিন ।
কাননে ছড়ায়ে সোনা উদাসী অঘ্রাণ চ'লে গেছে ।
পউষের অত্যাচারে সর্ব্বহারা হয়েছে বিপিন ॥

তথাপি অভাব মোর মিটে নাই মুহূর্ত্তের তরে ;
অপব্যয়ী প্রকৃতির অরক্ষিত দানসত্র হতে
অপহরি মহাবিত্ত আনিয়াছি বৎসরে বৎসরে
অন্তর্ভৌম কোষাগারে মরুলুপ্ত সুড়ঙ্গের পথে ॥

কিন্তু সে-ঔদার্য্য দেখে হয় নাই কার্পণ্য লজ্জিত,
সন্দেহের অবকাশ পায় নাই গৃধ্নুতা আমার ;
ফিরেছি ধনীর দ্বারে অপলাপী চীবরে সজ্জিত,
বলেছি নাটকী স্বরে—বিশ্বে শুধু সত্য অবিচার ॥

অন্তরঙ্গ সখাসম ফুলধনু আমার ইঙ্গিতে
ফুটায়েছে পারিজাত হিমরুক্ষ তুঙ্গ তপোবনে ;
স্বয়ম্বরা শৈলসুতা এসেছে কৌমার্য্য নিবেদিতে ;
টুটেছে দুঃস্বপ্ন মোর ব্রহ্মাণ্ডের মঙ্গলাচরণে ॥

তবু মোর নীলকণ্ঠে উঠে নাই কামোদ ঝঞ্ঝারি,
অনভ্যস্ত রসনায় উৎসারিত হয়নি দীপক ।
মোর প্রিয়সম্ভাষণে বিরহের আশঙ্কা সঞ্চারি
অন্তরের দ্বার জুড়ে হেসেছে অশ্লীল বিদূষক ॥

গোপন বৈভব আমি ব্যক্ত কভু করিনি প্রিয়ারে ;
বুঝি নাই বিনিময়, বিনা-বরে কুড়ায়েছি পূজা ;
অভিব্যপ্ত ক্ষুধা মম অবরোধে ঘিরেছে তাহারে,
পরিতৃপ্তি বিতরিতে পারেনি স্বয়ং দশভুজা ॥

নিমেষ না-যেতে তাই ফুরায়েছে প্রথম আবেশ,
উন্মীলিত বিলোচন জলিয়াছে বিপ্রলব্ধ লোভে,
অচিরাৎ সে-আগুন কামেরে করেছে ভস্মশেষ ;
অপর্ণা সেজেছে চণ্ডী আত্মহিতে মোর উপদ্রবে ॥

কেবলি চেয়েছি আমি, ক্ষতি কভু ছোঁয়নি আমারে,
কোনোদিন বজ্রাঘাতে সর্ব্বস্বান্ত করেনি উর্ব্বশী ;
মোর তারাদীপাবলী মূলাধার আমার ফুৎকারে
কথনো যায়নি নিবে, ধ্বংসমূক হয়নি ক্রন্দসী ॥

শিখিনি কদাপি আমি, কাম্য যার নিশ্চিন্ত অমরা,
অনির্ব্বাণ কুম্ভীপাকে হতে হয় তাহারে নিখাদ।
শুধুই জঞ্জালে তাই ভরিয়াছি প্রাণের পসরা,
গায়ত্রী জপেছি, কিন্তু শোনা গেছে নিরর্থ নিনাদ ॥

আমার মৃত্যুর দিনে তাই যদি অলস জিজ্ঞাসু
মাগে শবপরিচিতি, বিনা-ভাষ্যে বোলো তারে, সখা,—
জগতের কোনো কাজে লাগেনি এ-অখ্যাত গতাসু,
যায়নি অনাথ ক'রে কোনো মৌন হৃদয়-অলকা ॥

শীতলপাটি

যুবনাশ্ব

চিকণ শীতলপাটিটি বিছানো দখিন-দুয়ারী ঘরে,
গাল তারি 'পরে,
মাথার বালিশ কখন গিয়েছে সরে।
এ পাশে গড়ায় হালের প্রবাসী,
এলোমেলো, পাতা খোলা।
পড়ন্ত বেলা, এখনো ঘুমোয় আপন ভোলা।

শাড়ির আঁচল গায়ে নেই,
নেই খোঁপায় চুলের কাঁটা।
থরথর কাঁপে চম্পকাধর দিনের দুঃস্বপনে।
যদি দোষ হয়
পরে মাপ কোরো, না হয় কোয়ো না কথা।
এখন ত আমি ওষ্ঠপ্রান্ত এঁকে দেব চুম্বনে।

গালেতে পাটির লেগেছে দাগ,
ঠোঁটেতে আমার চুমো।
চোখের প্রশ্ন, ভালোবাসি কিনা,
কাল হবে।
আজ ঘুমো।

প্রশস্তি

সুরেশ্বর শর্ম্মা

আমার আকাশে যবে বর্ত্তমানে হেরি অস্তরাগ,
অনাগত ভবিষ্যের অরুণিমা তরুণের মুখে
নেহারি প্রত্যাশাপূর্ণ মুগ্ধ নেত্রে, জাগে পূর্ব্বরাগ
আমার মুমূর্ষু প্রেমে অভিনব দুঃখে আর সুখে।
এ জীবনে রহিল যা স্বপনের আকাশকুসুম,
তার প্রস্ফুটিত শোভা হেরি আমি আগামীর পটে,
পূর্ব্বাশার গিরিশৃঙ্গ হ'তে যেন আবীর কুঙ্কুম
মুঠি মুঠি উড়ে আসে আমার পশ্চিম গিরিতটে।

হে জবাকুসুমকান্তি নবরবি, করে নমস্কার
তোমারে অন্তিম শয্যাতললীন অপসৃয়মান
আমার নির্ব্বাণমুখী অস্তরবি, হর্ষে কম্পমান
যুক্ত করে; প্রসারিয়া ক্ষীণবাহু আশীর্ব্বাণী তার
জানায় তোমারে আজি, জীবনের শেষ স্নেহাঞ্জলি
লহ শিরে, ওঠ জাগি দীপ্ত তেজে ভুবন উজ্জ্বলি'।

মুক্তি না মৃত্যু

অনুপম গুপ্ত

সন্ধ্যা নামে ধীরে।
অস্তমিত তপনের ম্লান আভা
প্রকৃতির দৃশ্যপটে রচে মায়া মরণ-রঙের।
দূরে আকাশের গায়ে লঘু মেঘগুলি
ভঙ্গুর মুহূর্ত্তটিরে নিয়ে করে খেলা
চৈত্রের চপল বায়ে।
উল্লসিত মাধবী বিতান—তারই ক্ষিপ্র ছায়ে
সাঙ্গ করে রাত্রি-তরে বিরহ সন্তাপ।
এই ভাবে, মুক্তি-ছলে
দিবা মরে রজনীর জন্ম মাগি'।
অজানার উৎস হ'তে উচ্ছ্বসিয়া উঠি'
ফেনিল সর্পিল স্রোত মহাকাল-সাগরের দিকে
সতত চলেছে বহি'।
তরুণ রবির স্পর্শ মাখি' যত ফুলকলিদল
মুক্তি লাগি' মেলিল পল্লব
তাদেরি মৃত্যুর তরে
নিত্য এই স্রোতস্বতী চলেছে বহিয়া।

তাই ভাবি, মুক্তিভিক্ষু যত জীবনেরে
উৎসর্গিয়া উন্মার্গ-মৃত্যুর মত্ততায়
এ কী রহস্যের লীলা নিরন্তর খেলিছে প্রকৃতি!

আমি কবি বন্ধনের অবিচ্ছেদ্য কারাগারে ব'সে
হেরি যবে এই খেলা, প্রকৃতির নিত্য পরিহাস
অনুভবি দিবসের হত্যাকারী রজনীর প্রথম নিঃশ্বাস,
ভাবি, কবে, কোন্ নিশি-শেষে
প্রভাতের মুক্তি মাগি' অসহ্য মরণ এসে দেবে না কি হানা?
নীল আকাশের ভালে রাকা শশী স্বপ্ন-মাখা আলো
যবে করে শেষ—ধিকিধিকি তারারা নিঃশেষ,
সেথা এসে নিদ্রালসা উষা কহিবে না:
'জ্বালো দীপ জ্বালো'?
প্রজ্জ্বলিত অগ্নিসম ভাস্বর-কিরণ
আসিবে না নিদ্রা তার করিতে হরণ?
কোথা সেই ক্ষণ
তপন তেয়াগি যবে রক্তাম্বর—
মোর মুখে রবে চেয়ে বিপুল বিস্ময়ে
নিশান্তের শুকতারা সম।

মুক্তি-অভিলাষী আমি ভাবি তাই
মুক্তি-পথ অনুসরি' যাপিতেছি জীবনের দীর্ঘ দিনমান।
কিন্তু হায়, মুক্তিরে কি পেতে পারি হৃদয়ে আমার
মৃত্যু যেথা যাত্রার অলঙ্ঘ্য অন্তরায়?
মৃত্যুর সোপানে ঘেরা মুক্তির মন্দির।
সে তো মৃত্যু ভ্রূণ-মুক্ত মাতার জঠরে,
সে তো মৃত্যু সদ্যমুক্ত শিশুর অন্তরে।
ভস্ম করি' কৈশোরের স্বপ্নসুখ
যৌবনের সূর্য্য যবে ওঠে জলি' প্রদীপ্ত শিখায়,
কবি কাঁদে কবিতার কল্পনালতায়
ম্লান গোধূলি বেলায়।
শ্রাবণের বারিঝরা উতলা প্রহরে
প্রিয়ারে বাহুতে বাঁধে যবে
সেখানে কি মুক্তি তার?
সুকোমল শুভ্র তনু—তার প্রতি রোমকূপ হ'তে
সন্তর্পণে সর্পিল লাবণি বাহিরিয়া
বাঁধে তারে মরণের নাগপাশে।

যৌবনেরে ম্লান করি' মৃত্যু ব'য়ে আনে
মুক্তিকামী বার্দ্ধক্যেরে।

যুগ যুগ ধরি' তারা মুক্তি মাগে
ভয়মুক্তি, লোভমুক্তি, মোহমুক্তি,
মুক্তি নাকি স্বপ্নহীন ঘুম
নাকি ইন্দ্রিয়নিরোধ।
জীবনের সায়াহ্ন লগনে
ভক্ত যবে মনের মন্দিরে জ্বালে দীপ,
গুগ্‌গুল-সৌরভে ভরে গৃহ-কোন
নতশিরে দেয় সন্ধ্যারতি
মুক্তির প্রতীক্ষা করি'—
তবুও কি মুক্তি দেয় ধরা ?
সন্ধানের সন্ধ্যাশেষে সুন্দর সে আসে কি স্বেচ্ছায়
প্রিয়া সম পূর্ণ কামনায়
মরণে হরণ ক'রে বিরহের দিনগুলি সম ?
জীবনেরে রিক্ত করি' হানে তীব্র যেই পরাজয়
মরণের ছদ্মবেশ ধরি'
তারে তুমি মুক্তি বল, বল প্রিয়তম ?
ওরে মূঢ়, পুরাতন জীর্ণ মরণেরে
বার বার করেছ কামনা ভিন্ন রূপে, ভিন্ন নামে ;
তবু ভাঙিল না ভুল,
মুক্তিরে চাহিয়া তুমি চলিয়াছ নিরন্তর মৃত্যু-অভিসারে।

ঝরনা

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

ঝরনায় রূপসী আগুন ;
ঝরনায় অর্থহীন উল্লাস।
তোমার একমুঠো চুল আমার হাতে,
চোখে তোমার শুকতারার দীপ্তি।

চুম্বনের ভাষা আজ লুপ্ত
আজকের স্পর্শে অসহ উচ্ছ্বাস নেই ;
তবু মনে আমার আগুন,
তবু দেহে আমার অর্থহীন উল্লাস।

রাঙা সন্ধ্যা

অজিত দত্ত

রাঙা সন্ধ্যার স্তব্ধ আকাশ কাঁপায়ে পাখার ঘায়
ডানা মেলে দূরে উড়ে' চ'লে যায় দু'টি কম্পিত কথা,
রাঙা সন্ধ্যার বহ্নির পানে দু'টি কথা উড়ে' যায়!

পাখার শব্দে কাঁপে হৃদয়ের প্রস্তর-স্তব্ধতা,
দূর হ'তে দূর তবু কানে বাজে সে-পাখার স্পন্দন,
ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণ, ঝড়ের মতন তবু তা'র মত্ততা।

চ'লে যায় তারা চোখের আড়ালে—লক্ষ কথার বন
অট্টহাস্যে কোলাহল করে, তবুও তবুও কানে
কিসের আওয়াজ? বজ্র ছাপায়ে এ কি অলি-গুঞ্জন?

যাযাবর যত পক্ষী-মিথুন—থামে তারা কোন্‌খানে?
মানুষের ছায়া সে-আলোর নিচে পড়েছে কি কোনোদিন?
তুমি তো আমারে ভুলে যাবে নাকো—যদি যাই সন্ধানে?

তুমি নীড়, তুমি উষ্ণ কোমল; পাখার শব্দ ক্ষীণ,
তবু সে আমারে ডাকে, ডাকে শুধু ছেদহীন, ক্ষমাহীন।

বসন্তের গান

সমর সেন

বসন্ত-পীড়িত বন থেকে আজ
মদির গন্ধ আসে,
শুধু মনে পড়ে
নিঃসঙ্গ দ্বিপ্রহরে
সুদূর আকাশে চিলের ডাক।

নাহি জানে কেউ
রক্তে মোর নাচে আজি সমুদ্রের ঢেউ।
মালতী রায়ের নরম উষ্ণ শরীর
রাত্রের ঘুমে আর দিনের চিন্তায়
সমুদ্রের জোয়ার এনেছে রক্তে।
দিকে দিকে আজ হানা দিল
নিষ্ঠুর বসন্ত।

তবু বসন্তের রাত্রে
স্বপ্নে দেখি ধূসর পাহাড়,
অন্ধকারে শুনি কিসের বিবর্ণ পদক্ষেপ,
আর কর্কশ হাসির স্রোত
অকারণে অন্তরে কাঁপে ;
শিশিরে আর হাওয়ায় বিষণ্ণ সকালে
আবার রক্তে আসে সমুদ্রের গান,
তবু বসন্তের রাত্রে
স্বপ্নে দেখি ধূসর পাহাড়
বিলাসের দিন শেষ, দুরন্ত বনের বাঘ

প্রকৃতির কবি

বিদ্যালয়ে ইংরিজি কাব্যের পাঠ নিতে গিয়ে যখন শোনা যায় যে ওয়ার্ডস্বার্থ প্রকৃতির কবি তখন সহজবুদ্ধিতে সংশয় লাগে। প্রকৃতির কবি কোন্ কবি নন্? প্রকৃতির অফুরন্ত লীলাবৈচিত্র্য অন্তত কখনো-কখনো ভালো না লাগে এমন নিরেট সাধারণ লোকের মধ্যেও যখন দেখা যায় না, তখন কবিনামের যোগ্য যে-কোনো ব্যক্তির সূক্ষ্ম হৃদয়বৃত্তিকে অতি তীব্রভাবেই তা নাড়া দেবে এ তো জানা কথা। শেক্স্‌পিয়র কি প্রকৃতির কবিও নন? শেলি? কীট্‌স্? যদি বলা হয় যে ওয়ার্ডস্বার্থ জড়প্রকৃতির মধ্যে এক জীবন্ত ও সর্বব্যাপক সত্তা খুঁজে পেয়েছিলেন—সত্যি বলতে, সকল কবির কাছেই প্রকৃতি জীবন্ত, এবং এ-উপলব্ধি শেলির মত তীব্র অন্য কোন্ কবিতে তা জানিনে। যদি বলা হয় ওয়ার্ডস্বার্থের প্রকৃতিপ্রেম ছিল তাঁর পক্ষে ধর্মের সামিল সে-কথা মানবো; কিন্তু সেই ধর্মের সারতত্ত্ব অ্যাজ ইউ লাইক ইট্-এর নির্বাসিত ডিউক খুব সংক্ষেপেই কি বলেননি—হয়তো কিঞ্চিৎ তাচ্ছিল্যের সুরে—যখন তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন 'books in the running brooks, sermons in stones, and good in everything'? এর চেয়ে বেশি ওয়ার্ডস্বার্থ কী বলেছেন?

তবে এটা সত্য যে প্রকৃতি ছাড়া অন্য-কোনো বিষয়ে ওয়ার্ডস্বার্থ কবিতা লেখেননি, লিখলেও সফল হননি। সেইজন্যে ইংরিজি সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি প্রকৃতির কবি লেবেল-আঁটা। কবিদের গায়ে লেবেল আঁটা থাকলে ডক্টরেট ডিগ্রিকামীদের সহায়তা হয়, কিন্তু রসোপলব্ধিতে ব্যাঘাত ঘটে। প্রকৃতিবিষয়ক কবিতার সমস্তটা ক্ষেত্র যেন ওয়ার্ডস্বার্থেরই দখলে; প্রকৃতি সম্বন্ধে নতুনরকমের অনুভূতি ও আবেগ পরবর্তীযুগের যে-সব কবিতে পাওয়া যায়—যেমন ডেভিস, এড্‌ওয়ার্ড টমাস—তাঁদের কাব্য সম্বন্ধে যথেষ্ট মনোযোগী কি শ্রদ্ধাবান হ'তে যদি আমরা ভুলে যাই, সেজন্য

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ই দায়ী। প্রকৃতি সম্বন্ধে ওয়ার্ডস্বার্থের মনোভঙ্গি তো একমাত্র নয়, এবং ভিন্ন মনোভঙ্গি আমাদের অনেকের পক্ষেই হয়তো বেশি উপভোগ্য হ'তে পারে।

আমাদের কবিদের মধ্যে অবশ্য রবীন্দ্রনাথই প্রকৃতির কবি হিসেবে প্রধান। এ-কথা বললেও ভুল হয় না যে তাঁর কাব্যের প্রধান বিষয়ই প্রকৃতি। যত কবিতা ও গান তিনি লিখেছেন, তার মধ্যে বেশির ভাগই তো সোজাসুজি ঋতুসংক্রান্ত। তা ছাড়া, তাঁর 'জীবন-দেবতা'র উপলব্ধিও মুখ্যত প্রকৃতির ভিতর দিয়ে; গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য প্রভৃতি 'আধ্যাত্মিক' গ্রন্থও এ-বিষয়ে নিঃসংশয় সাক্ষ্য দেবে।

অবশ্য একহিসেবে সকল কবিই প্রকৃতির কবি, এ-কথা পূর্বেই বলেছি। কিন্তু সকল কবিকেই ঐ আখ্যা দেওয়া যায় না; কারণ সকলের পক্ষেই প্রকৃতি একমাত্র কি প্রধান বিষয় নয়। অনেক কবির পক্ষে প্রকৃতি মানবজীবনের নানা অভিজ্ঞতার পটভূমিকা; অনেকের পক্ষে ইন্দ্রিয়ের বিলাস, অনেকের পক্ষে প্রেমের উদ্দীপনা ও প্রতিক্রিয়ামাত্র। প্রকৃতিকে অতি নিবিড়ভাবে অনুভব না করেন এমন কোনো কবি নেই; কিন্তু সমগ্র জীবনকে প্রকৃতির ভিতর দিয়েই গ্রহণ করেন এমন কবির সংখ্যা অল্প। তাঁরাই বিশেষভাবে প্রকৃতির কবি।

আমার মনে হয়, আমাদের আধুনিক কবিদের মধ্যে একজনকে এই বিশেষ অর্থে প্রকৃতির কবি বলা যায়: তিনি জীবনানন্দ দাশ। তাঁর নব-প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ধূসর পাণ্ডুলিপি প'ড়ে এই কথাই আমার মনে হ'লো। অবশ্য এই বইয়ের কবিতাগুলো আমার পক্ষে একেবারে নতুন নয়। এদের রচনার কাল আজ থেকে এগারো বছর ও সাত বছরের মধ্যে; এবং সেই সময়ে এরা যখন অধুনালুপ্ত কয়েকটি মাসিকপত্রে আত্মপ্রকাশ করে, তখন থেকেই এদের সঙ্গে আমার পরিচয়। জীবনানন্দর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ঝরা পালক ১৩৩৪ সালে বেরিয়েছিলো, এবং তার রচনাকাল আরো কিছু আগে হবে নিশ্চয়ই। সে-বইখানা তখনো কারো বিশেষ নজরে পড়েনি, এখন তো একেবারেই বিস্মৃত। মোহিতলালের স্বপন-পসারীর মত, ঝরা পালকেও সত্যেন দত্তর প্রভাব

ছিলো স্পষ্ট। যে-মৌতাতের ঝোঁকে মোহিতলাল এই লাইন লিখতে পেরেছিলেন—

উটপাখী তার ডিমজোড়া কি লুকিয়েছে ঐ বুকে

সেটা জীবনানন্দও এড়াতে পারেননি তখন। ঝরা পালকে স্মরণীয় বিশেষ-কিছু হয়তো ছিলো না, কিন্তু তার কয়েকটি লাইন দেখছি আজো ভুলতে পারিনি:

ডাকিয়া কহিল মোরে রাজার দুলাল—
ডালিমফুলের মত ঠোঁট যার, পাকা আপেলের মত লাল যার গাল,
চুল যার শাঙনের মেঘ, আর আঁখি যার গোধূলির মত গোলাপি রঙিন,
তারে আমি দেখিয়াছি প্রতি রাত্রে—স্বপ্নে—কতদিন।

সত্যেন দত্তীয় ঝঙ্কার থেকে এ অনেক দূরে; অতি পুরোনো কল্পনা যেন একটি নতুন ও অপূর্ব রূপ পেয়েছে এখানে। তার কারণ ছন্দের নবত্ব, ধ্বনির বৈশিষ্ট্য। কয়েকটি লাইনে সম্পূর্ণ একটি ছবি পেলুম; এ-ছবির রচনায় যে কলাকৌশল লেগেছে, তা এই কবিরই নিজস্ব সৃষ্টি। বস্তুত, এখানে জীবনানন্দর নিজস্ব সৃষ্টিপ্রেরণারই পরিচয় পাওয়া যায়; পড়তে-পড়তে মনে হয় একজন নতুন কবির বুঝি দেখা পেলুম।

এই সৃষ্টিপ্রেরণা অবশ্য চাপা থাকলো না; অল্প সময়ের মধ্যে দেখা গেলো তার প্রগতি ও পরিণতি। সে সময়ে জীবনানন্দ যে-সব কবিতা বিভিন্ন মাসিকপত্রে প্রকাশ করেন তা প'ড়ে আমি মুগ্ধ হয়েছিলুম; এবং এখন সেগুলোই দেখতে পাচ্ছি ধূসর পাণ্ডুলিপিতে একত্রিত। ভালো কবিতার কেমন একটা আদিম অপূর্বতা আছে: মনে হয় এ যেন সদ্যোজাত অথচ চিরন্তন; এইমাত্র এই মুহূর্তে এর জন্ম হ'লো, এবং চিরকালের মধ্যে এর মতো আর কিছু হবে না। এই কবিতাগুলোয় ছিলো সেই সুরের অনন্যতা ও অখণ্ডতা; প্রতিটি রচনার ভিতর দিয়ে এমন একটা স্বর বুকে এসে লাগলো, যেরকম আর কখনো শুনিনি। একেবারে নতুন সেই স্বর, আর এমন অদ্ভুত যে চমকে উঠতে হয়।

বছর দশেক পরে সেই কবিতাগুলোই আবার প'ড়ে সেইরকমই ভালো লাগলো। ইতিমধ্যে জীবনানন্দর কাব্যপ্রেরণা ঝিমিয়ে পড়েনি, তার প্রমাণ

তিনি সম্প্রতি সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় দিয়েছেন। সত্যি বলতে, আমাদের আধুনিক কবিদের মধ্যে তিনিই বোধ হয় সব চেয়ে সক্রিয়। তাঁর কল্পনা সর্বদাই নব-নব রূপের সন্ধানী, তাঁর রচনাভঙ্গি গভীরতর পরিণতির দিকে ঝুঁকছে। কিন্তু এতদিনেও আমাদের সাহিত্যের বাজারে তাঁর খ্যাতির রোল ওঠেনি। আমাদের সুধীশ্রেণীও তাঁর কাব্যের সঙ্গে যথেষ্ট পরিচিত, এমন মনে হয় না। আধুনিক বাঙলা কাব্য সম্বন্ধে কোনো আলোচনাতেই জীবনানন্দর উপযুক্ত উল্লেখ এ-পর্যন্ত দেখেছি ব'লে মনে পড়ে না। জীবনানন্দর ব্যক্তিত্ব লোকচক্ষু থেকে একেবারেই প্রচ্ছন্ন, এ ছাড়া এই অন্যায়ের আর-কোনো কারণ আছে কিনা জানিনে। কবিতা ছাড়া আর-কিছু তিনি লেখেন না, কোনো সাহিত্যিক গোষ্ঠীভুক্ত হ'য়ে দেশেবিদেশে আত্মরটনার আয়োজন তিনি কখনোই করেননি। আমার বিশ্বাস, এ-পর্যন্ত দু'জন চারজনের বেশি অনুরাগী পাঠক তাঁর জোটেনি। তবে এটাও লক্ষ্য করবার যে অতি-আধুনিক বাঙলা কাব্যে তাঁর প্রভাব বেশ স্পষ্ট।

২

আমাদের বাঙলাদেশের পাঠকসাধারণের মধ্যে জীবনানন্দ যদি অজ্ঞাতই থাকেন সেটা আশ্চর্য্যের বিষয় নয়, তবে গুণী যাঁরা, কাব্যসম্ভোগের প্রকৃত অধিকারী যাঁরা, তাঁদের মধ্যে ধূসর পাণ্ডুলিপি প্রকাশের পর তিনি স্বীকৃত ও সম্মানিত হবেন এ-আশা জোর ক'রেই করা যায়। ধূসর পাণ্ডুলিপি প'ড়ে এ-কথাই প্রথমে মনে হয় যে এই লেখকের আছে সত্যিকারের স্টাইল। কোথাও-কোথাও সেটা হয়তো মুদ্রাদোষে অবনত হয়েছে (যদিও সেটা খুব কম), এবং তা নিয়ে ঠাট্টা করাও খুব সোজা। কিন্তু যদি আমরা সত্যি কবিত্বশক্তিকে শ্রদ্ধা করি, যদি কবিতা আমাদের পক্ষে ইয়ারকির বিষয় না-হ'য়ে গভীর অনুশীলনের বিষয় হয়, তবে এ-কথা আমাদের মানতেই হবে যে এই কবি এমন একটি সুরের সম্মোহন সৃষ্টি করেছেন যা ভোলা যায় না, যা ভুল হয় না, যা হানা দেয়।

জীবনানন্দ প্রকৃত কবি ও প্রকৃতির কবি। ঠিক প্রেমের কবিতা বলতে যা বোঝায় ধূসর পাণ্ডুলিপিতে তা একটিও নেই। 'নির্জন স্বাক্ষর' '১৩৩৩'

'সহজ' 'কয়েকটি লাইন' এ-সমস্ত কবিতায় প্রেমের পাত্রী অপেক্ষা পারিপার্শ্বিক প্রকৃতিই অনেক বড়ো ও জীবন্ত হ'য়ে উঠেছে কবির কল্পনায়। এটা উল্লেখযোগ্য যে জীবনানন্দ একেবারেই রবীন্দ্রনাথের প্রভাবমুক্ত। উনবিংশ শতাব্দীর ইংরিজি কাব্যস্রোতে প্রচুর পান করেছেন তিনি; 'জীবন' 'প্রেম' এই দীর্ঘ কবিতাদুটিতে শেলি কীট্‌স্ উভয়েরই প্রভাব স্পষ্ট। কিন্তু সাধারণভাবে বলতে গেলে, শেলির চাইতে বরঞ্চ কীট্‌সের প্রভাব বেশি, কীট্‌সের চাইতে বরঞ্চ সুইনবর্ন ও প্রির‍্যাফেলাইটদের। এবং সব চেয়ে বড়ো কথা যেটা, সমস্ত প্রভাব ছাপিয়ে উঠেছে তাঁর নিজস্ব দৃষ্টি ও সৃজনীশক্তি। যে-দৃষ্টিতে অতি সাধারণ অপরূপ হ'য়ে ওঠে, তুচ্ছকে ঘিরে গ'ড়ে ওঠে মহিমামণ্ডল, সেই দৃষ্টি জীবনানন্দর। অতি ছোট-ছোট জিনিস নিয়ে অতি সূক্ষ্ম সঙ্গীতের জাল তিনি এমনভাবে বুনে গেছেন যে বিশ্লেষণ ধরা দিতে চায় না।

বলি আমি এই হৃদয়েরে :
সে কেন জলের মত ঘুরে ঘুরে একা কথা কয়!

ছন্দের বাঁকাচোরা গতিতে, সূক্ষ্ম ধ্বনিতে ও বিরতিতে, পুনরুক্তিতে ও ও প্রতিধ্বনিতে মনে হয় যেন এই কবিতাগুলো আঁকাবাঁকা জলের মতই ঘুরে ঘুরে একা কথা বলছে। এদের আবহতে আছে একটি সুদূরতা ও নির্জনতা; আমাদের পরিচিত পরিবেষ ছাড়িয়ে, এই আকাশ আর পৃথিবী ছাড়িয়ে, অন্য কোনো আকাশে অন্য কোনো জগতে এক সম্পূর্ণ রূপকথার রচনা। জীবন ক্ষয়শীল ও পরিবর্তনশীল, মৃত্যুতে সব জিনিসেরই সমাপ্তি, এই আদিম বেদনা জীবনানন্দর কাব্যের ভিত্তি।

পৃথিবীর বাধা—এই দেহের ব্যাঘাতে
হৃদয়ে বেদনা জমে;—স্বপনের হাতে
আমি তাই
আমারে তুলিয়া দিতে চাই! …
পৃথিবীর দিন আর রাতের আঘাতে
বেদনা পেত না তবে কেউ আর,—
থাকিত না হৃদয়ের জরা,—
সবাই স্বপ্নের হাতে দিত যদি ধরা! …

ইয়েট্স্-এর লাইন মনে পড়বে অনেকেরই ; এ-কথা অনেক কবিরই মনের কথা সন্দেহ নেই। স্বপ্নের হাতে ধরা দিতে চান যে-সব কবি তাঁদের প্রত্যেকেরই 'স্বপ্ন' বিশেষ একটি রূপকথার মূর্তিগ্রহণ করে। প্রকৃতির নির্জন ও প্রচ্ছন্ন রূপের মধ্যে জীবনানন্দ তাঁর রূপকথা সৃষ্টি করেছেন।

তার পর,—একদিন
আবার হলদে তৃণ
ভ'রে আছে মাঠে,—
পাতায়, শুকনো ডাঁটে
ভাসিছে কুয়াসা
দিকে দিকে, চড়ুয়ের ভাঙা বাসা
শিশিরে গিয়েছে ভিজে,—পথের উপর
পাখীর ডিমের খোলা, ঠাণ্ডা—কড়কড়্ !
শসাফুল,—দু' একটা নষ্ট সাদা শসা,—
মাকড়ের ছেঁড়া জাল,—শুকনো মাকড়্সা
লতায় পাতায় ;—
ফুটফুটে জ্যোৎস্নারাতে পথ চেনা যায় ;
দেখা যায় কয়েকটা তারা
হিম আকাশের গায়,—ইঁদুর-পেঁচারা
ঘুরে যায় মাঠে মাঠে, ক্ষুদ খেয়ে ওদের পিপাসা আজো মেটে,
পঁচিশ বছর তবু গেছে কবে কেটে !

('মাঠের গল্প')

আকাশের মেঠো পথে থেমে ভেসে চলে চাঁদ ;
অবসর আছে তার,—অবোধের মতন আহ্লাদ
আমাদের শেষ হবে যখন সে চ'লে যাবে পশ্চিমের পানে,—
এটুকু সময় তাই কেটে যাক্ রূপ আর কামনার গানে !

* * *

এখানে নাহিক' কাজ,—উৎসাহের ব্যথা নাই, উদ্যমের নাহিক ভাবনা ;
এখানে ফুরায়ে গেছে মাথার অনেক উত্তেজনা।

অলস মাছির শব্দে ভ'রে থাকে সকালের বিষণ্ণ সময়,
পৃথিবীরে মায়াবীর নদীর পারের দেশ ব'লে মনে হয় !
সকল পড়ন্ত রৌদ্র চারিদিকে ছুটি পেয়ে জমিতেছে এইখানে এসে
গ্রীষ্মের সমুদ্র থেকে চোখের ঘুমের গান আসিতেছে ভেসে,
এখানে পালঙ্কে শুয়ে কাটিবে অনেকদিন জেগে থেকে ঘুমাবার সাধ ভালোবেসে।

('অবসরের গান')

কহিল সে,—উত্তর সাগরে
আর নাই কেউ !—
জ্যোৎস্না আর সাগরের ঢেউ
উচুনীচু পাথরের 'পরে
হাতে হাত ধ'রে
সেইখানে ; কখন জেগেছে তারা—তারপর ঘুমাল কখন্ !
ফেনার মতন তারা ঠাণ্ডা—শাদা,—
আর তারা ঢেউয়ের মতন
জড়ায়ে জড়ায়ে যায় সাগরের জলে !
ঢেউয়ের মতন তারা ঢলে !
সেই জল-মেয়েদের স্তন
ঠাণ্ডা,—সাদা,—বরফের কুঁচির মতন !
তাহাদের চোখ মুখ ভিজে,—
ফেনার সেমিজে
তাহাদের শরীর পিছল !
কাচের গুঁড়ির মত শিশিরের জল
চাঁদের বুকের থেকে ঝরে
উত্তর সাগরে !

('পরস্পর')

এই সমস্ত রচনায় আধো আলোর লীলা, আধো ঘুমের মোহ ; এই আবছায়ায়, এই অলসতায় কবির মুক্তি।

জীবনানন্দর কাব্যে দেখা যায় রূপক রচনার অজস্রতা, সেই রূপকের বিশেষত্বও উল্লেখযোগ্য। যত উপমায় যত ইঙ্গিতে তিনি কল্পনাকে প্রকাশ

করেন সেগুলো ভাবাত্মক নয়, রূপাত্মক, চিন্তাপ্রসূত নয়, অনুভূতিপ্রসূত। আমাদের কবিদের মধ্যে জীবনানন্দ সব চেয়ে কম 'আধ্যাত্মিক,' সব চেয়ে বেশি 'শারীরিক'; তাঁর রচনা সব চেয়ে কম বুদ্ধিগত, সব চেয়ে বেশি ইন্দ্রিয়গত। তাঁর এই বিশেষত্বই কীট্স্ ও প্রির‍্যাফেলাইটদের কথা মনে করিয়ে দেয়। তাঁর একটি কবিতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ একবার বলেছিলেন 'চিত্ররূপময়'। জীবনানন্দর সমগ্র কাব্য সম্বন্ধেই এই আখ্যা প্রযুজ্য। কথা দিয়ে ছবি আঁকতে তাঁর নিপুণতা অসাধারণ। তার উপর, ছবিগুলো শুধু দৃশ্যের নয়, গন্ধের ও স্পর্শেরও বটে। গন্ধ ও স্পর্শ দিয়ে অনেক অপরূপ অভিজ্ঞতা আমরা সংগ্রহ করি; কিন্তু এই দুই ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি জীবনানন্দর মত এত পূর্ণমাত্রায় আমাদের আর কোন্ কবি ব্যবহার করেছেন জানি না। তাঁর যে-কবিতাটি প'ড়ে রবীন্দ্রনাথ ঐ মন্তব্য করেছিলেন, তা থেকে কয়েকটি ছবি উদ্ধার করছি :

দেখেছি সবুজ পাতা অঘ্রাণের অন্ধকারে হয়েছে হলুদ,
হিজলের জানালায় আলো আর বুলবুলি করিয়াছে খেলা,
ইঁদুর শীতের রাতে রেশমের মত রোমে মাখিয়াছে খুদ,
চালের ধূসর গন্ধে তরঙ্গেরা রূপ হ'য়ে ঝরেছে দু'বেলা
নির্জ্জন মাছের চোখে ;—পুকুরের পারে হাঁস সন্ধ্যার আঁধারে
পেয়েছে ঘুমের ঘ্রাণ—মেয়েলি হাতের স্পর্শ ল'য়ে গেছে তারে ;

মিনারের মত মেঘ সোনালি চিলেরে তার জানালায় ডাকে,
বেতের লতার নিচে চড়ুয়ের ডিম যেন শক্ত হ'য়ে আছে,
নরম জলের গন্ধ দিয়ে নদী বার বার তীরটিরে মাখে,
খড়ের চালের ছায়া গাঢ় রাতে জ্যোৎস্নার উঠানে পড়িয়াছে ;
বাতাসে ঝিঁঝিঁর গন্ধ—বৈশাখের প্রান্তরের সবুজ বাতাসে ;
নীলাভ নোনার বুকে ঘন রস গাঢ় আকাঙ্ক্ষায় নেমে আসে ;

('মৃত্যুর আগে')

এই ছবিগুলি সম্পূর্ণই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ; স্পর্শ আর গন্ধ তো আছেই, রসনার স্বাদও একেবারে বাদ পড়েনি। এ তো সত্যি কথা যে আমাদের সমস্ত অনুভূতিই শরীরের মারফৎ এসে পৌঁছয় ; অথচ কবিতায় এই অনুভূতিগুলোর অবিমিশ্র প্রকাশ অনেকেই করেন না কি করতে পারেন না, উপরন্তু যদি কেউ করেন তাঁর কপালে অজস্র নিন্দাই জোটে। কীট্স্ যে 'sensuous' মাত্র, 'sensual' নন, সেটা প্রমাণ করতে অধ্যাপকরা গলদ্‌ঘর্ম! এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার জন্যেই রসেটি সুইনবর্নের লাঞ্ছনা। আমাদের কবিদের মধ্যে ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি সম্বন্ধে এই সূক্ষ্ম চেতনা জীবনানন্দর মত আর কারুরই নেই ; তাঁর রচনায় তত্ত্ব নেই, চিন্তাশীলতা নেই ; কোনো কৃত্রিমতা কি অনুকরণ নেই ; তা স্বতঃস্ফূর্ত্ত, বিশুদ্ধ ও সহজ, ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ ও জীবন্ত অভিজ্ঞতার সৃষ্টি ; তা নিছক কবিতা, কবিতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

৩

পরিশেষে আঙ্গিকের দিক থেকে দু' একটি কথা বলতে ইচ্ছা করি। জীবনানন্দর কান নিখুঁত। ছন্দকে ইচ্ছামত বেঁকিয়ে-চুরিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে তিনি নিয়ে গেছেন, যেখানে আটকেছে সেখানে আটকানোটাই কবির উদ্দেশ্য ছিলো। একই ছন্দের ছাঁচ বিভিন্ন কবির হাতে বিভিন্ন সুরে বাজে এটা পুরোনো কথা ; ধূসর পাণ্ডুলিপি তার চমৎকার দৃষ্টান্ত। এ-বইয়ের সবগুলো কবিতাই পয়ারজাতীয় ছন্দে ; বেশির ভাগ অসমমাত্রার, যাকে বলতেই হয় বলাকার ছন্দ। অর্থাৎ চেহারাটা বলাকার ছন্দের, কিন্তু ধ্বনি একেবারেই ভিন্ন। বলাকার তীব্রতা ও বেগ নেই এখানে ; এ-ছন্দ মন্থর, যেন ইচ্ছে ক'রে ভাঙা-ভাঙা, অসমান ও পালিশ-না-করা, এ-ছন্দ থেমে-থেমে ঘুরে-ঘুরে চলে, ঘুমে ভরা সুদূর এর সুর, স্বপ্নে-ভরা, শিশির-কোমল, যেন ঘুমের মধ্যে গান এসে কানে লাগে, তারপর সমস্ত রাত হানা দেয়। কলাকৌশলের অভাব নেই এই কবিতাগুলিতে, সেগুলোর প্রধান গুণ এই যে তারা প্রচ্ছন্ন। মিলে, অন্তর্লীন মিলে, অনুপ্রাসে, পুনরুক্তিতে ধ্বনির সূক্ষ্মতা ও বৈচিত্র্য প্রতি পংক্তিতে বেজে উঠছে ; সে যেন অপার্থিব ও পলাতক, স্বপ্নের সুরঙ্গে অলস ভাবনার যাওয়া-আসা।

বোম্বায়ের সহরের জাহাজ কখন
বন্দরের অন্ধকারে ভিড় করে, দেখে তাই ;—একবার স্নিগ্ধ মালাবারে
উড়ে যায় ; কোন্ এক মিনারের বিমর্ষ কিনার ঘিরে অনেক শকুন
পৃথিবীর পাখীদের ভুলে গিয়ে চ'লে যায় যেন কোন্ মৃত্যুর ওপারে।

('শকুন')

ধ্বনির দিক থেকে এর চেয়ে ভালো রচনা ধূসর পাণ্ডুলিপিতে নেই। এই ধ্বনি উচ্চ নয় তীব্র নয়, কিন্তু গভীর ও প্রতিধ্বনিময়। নামশব্দ ও বিদেশী শব্দের ব্যবহারে এতখানি কৃতিত্ব আর কোনো আধুনিক কবির দেখিনি। জীবনানন্দ নামশব্দ ব্যবহার করেন মিলটনের মত জমকালো ধ্বনি সৃষ্টি করতে নয়, প্রির্যাফেলাইটদের মত ছবি ফোটাতে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে উজ্জয়িনী মালবিকা প্রভৃতি পুরাযুগের নাম যে-উদ্দেশ্য সাধন করে, ঠিক সেই উদ্দেশ্যই জীবনানন্দ সাধিত করেছেন বোম্বাই বনলতা সেন প্রভৃতি আধুনিক 'কবিত্ব'হীন নাম দিয়ে।

সাগরের অই পারে—আরো দূর পারে
কোনো এক মেরুর পাহাড়ে
এই সব পাখী ছিল ;
ব্লিজার্ডের তাড়া খেয়ে দলে দলে সমুদ্রের 'পর
নেমেছিল তারা তারপর,—
মানুষ যেমন তার মৃত্যুর অজ্ঞানে নেমে পড়ে !
বাদামি—সোনালি—শাদা—ফুটফুট ডানার ভিতরে
রবারের বলের মতন ছোট বুকে
তাদের জীবন ছিল,—
যেমন রয়েছে মৃত্যু লক্ষ-লক্ষ মাইল ধ'রে সমুদ্রের মুখে
তেমন অতল সত্য হ'য়ে ! ('পাখীরা')

ইংরিজি শব্দগুলোকে বাঙলার প্রাকৃত ছন্দের সঙ্গে এমনভাবে মেশানো হয়েছে যে আশ্চর্য্য বলতে হয়। একটু খোঁচ নেই। এটাও লক্ষ্য করবার যে জীবনানন্দর পয়ারে যুক্তাক্ষর কম। যুক্তাক্ষরের অভাবে পয়ারের শিথিল ও মেরুদণ্ডহীন হ'য়ে পড়বার আশঙ্কা থাকে ; কিন্তু এই

কবি একটি লাইনও লেখেননি যাতে ঋজুতা, দৃঢ়তা কি গাম্ভীর্য্যের অভাব। বরঞ্চ, যুক্তাক্ষরের স্বল্পতাই কবি এমনভাবে ব্যবহার ক'রেছেন যাতে পয়ারে লেগেছে নতুন সুর।

এই আলোচনা আমি দীর্ঘ করলুম কেননা জীবনানন্দ দাশকে আমি আধুনিক যুগের একজন প্রধান কবি ব'লে বিবেচনা করি, এবং ধূসর পাণ্ডুলিপি তাঁর প্রথম পরিণত গ্রন্থ। আমার নিজের তাঁর কবিতা অত্যন্তই ভালো লাগে, কিন্তু আশা করি নেহাৎই আমরা ব্যক্তিগত অভিরুচির দ্বারা এই মতামত গঠিত হ'তে দিইনি। আমাদের দেশে কোনো ক্ষেত্রেই কোনোরকম স্ট্যাণ্ডার্ড নেই, সাহিত্যে একেবারেই নেই। প্রতিভা হয় অবজ্ঞাত, তৃতীয় শ্রেণীর কবি অভিনন্দিত হয় অ-সাহিত্যিক কারণে। আমাদের মূল্যজ্ঞানহীন সমাজের মূঢ়তাকে মাঝে-মাঝে নাড়া দেয়াই দরকার ; নিজের বিশ্বাসটা মাঝে-মাঝে জোর ক'রেই বলা দরকার। এ-দেশে মাতৃভাষার সাহিত্যকে যাঁরা শ্রদ্ধা ক'রে ভালোবাসেন (যদি আজকালকার দিনে এমন কেউ থাকেন) তাঁরা ধূসর পাণ্ডুলিপি নিজের গরজেই পড়বেন, কারণ এ-বইয়ের পাতা খুললে তাঁরা একজনের পরিচয় পাবেন যিনি প্রকৃতই কবি, এবং প্রকৃত অর্থে নতুন। বিশেষ ক'রে, 'শকুন,' 'পাখীরা', 'অবসরের গান', 'মৃত্যুর আগে', 'ক্যাম্পে' এ-সব কবিতা প'ড়ে তাঁরা স্বতঃই উপলব্ধি করবেন যে বাঙলা কাব্যের ক্ষেত্রে এক অপূর্ব্ব শক্তির আবির্ভাব হয়েছে।

নতুন কবিতা

ব্রাউনিঙ পঞ্চাশিকা। সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, দুই টাকা।

কবিতার অনুবাদ সম্বন্ধে আমি একটি মত পোষণ ক'রে এসেছি। হয়তো সেটা নেহাৎই ব্যক্তিগত, তবু এখানে বলি। অতি বিখ্যাত কি কি অতি মহৎ কাব্যের অনুবাদ চেষ্টা করাই উচিত নয়—আর যদি এ-দুঃসাহসী চেষ্টা না-করলেই নয় তবে ছন্দ-মিল বজায় রেখে নিকট অনুসরণ না-ক'রে মুক্তছন্দের গদ্যে করাই যুক্তিসঙ্গত। অপেক্ষাকৃত অপরিচিত, অপেক্ষাকৃত মাঝারি কবিতাই তর্জমা করবার পক্ষে ভালো। যদি কেউ মনে করেন আমি নিজে কোনো মহৎ কবিতার অনুবাদে হাত দিইনি কি হাত দিয়েও সফল হইনি, আমার এ-মতের এ ছাড়া আর কোনো ভিত্তি নেই, তাহ'লে দু' একটা দৃষ্টান্ত দিই। শ্রীযুক্ত হুমায়ুন কবীর ছাত্রাবস্থায় কীট্‌সের ওড টু নাইটিঙ্গেল প্রভৃতি কয়েকটি পল্‌গ্রেভ রত্নের ভাবান্তর সাধন করেছিলেন। তাঁর অনুবাদ ব্যর্থ হয়েছিলো বললে তাঁর উপর দোষারোপ করা হয় না। ঐ কবিতা এবং ঐরকম কবিতার অনুবাদ ব্যর্থ হ'তেই বাধ্য এ-কথাই আমার মনে হয়েছিলো তখন। পরিচয়ের পৃষ্ঠায় শেলির 'One word is too often profaned' কবিতার বিভিন্ন অনুবাদ প'ড়ে আমার এ-মত আরো দৃঢ়ই হয়েছিলো। যতদূর মনে করতে পারি, ঐ পত্রিকাতেই শ্রীযুক্ত হিরণকুমার সান্যালের শেলির রাত্রি কবিতার অনুবাদ এর একমাত্র ব্যতিক্রম। কপালগুণে ও-রকম তর্জমা হয়।

সত্যেন দত্তর কথা ভাবুন। কবিতার অনুবাদে এমন পরিষ্কার হাত আর-কেউ দেখাননি; কিন্তু তাঁর কৃতিত্বের দৃষ্টান্ত কীটস্‌-এর লা বেল্ দাম্ নয়, নোগুচির ওহারু কবিতা। নানা ভাষা থেকে যত ছোট-ছোট উজ্জ্বল রচনা তিনি মাতৃভাষায় আহরণ করেছিলেন তার কোনোটিই

কাব্যপর্য্যায়ে শ্রেষ্ঠতার দাবি রাখে না; সেগুলো ভালো কবিতা, কিন্তু মহৎ কবিতা নয়, এবং অনুবাদকের কৃতিত্বের সেটাও একটা কারণ। সত্যেন্দ্রনাথ ওড টু ওয়েস্ট উইণ্ড তর্জমা করতে যাননি, এ-জন্য তাঁর প্রশংসাই করবো। মহৎ কাব্যের অনুবাদ প্রায় অসম্ভব।

তবে একেবারেই যে অসম্ভব তাও বা বলি কেমন ক'রে? যা এ-পর্য্যন্ত হয়নি সেটা কখনোই হবে না এটাও অন্ধ ধারণা বইকি। প্রতিভা থাকলে কী না হয়? সফোক্লিসের ঈডিপস ইয়েটস তো ইংরিজি পদ্যে লিখেছেন। আমি এক বর্ণও গ্রীক জানিনে; তবু সাহস ক'রে বলবো যে ইয়েটস-এর অনুলিখন যত ভালো, সফোক্লিসের রচনা যদি ঠিক ততটাই ভালো হয়, তাহ'লেও তাঁর বিরাট খ্যাতি সার্থক। ফিটজেরাল্ড ইত্যাদি মামুলি উদাহরণ তো আছেই। ক্ষমতা থাকলে বাঙলায় শেক্সপিয়র কি ব্রাউনিঙই বা অসম্ভব হবে কেন?

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র ব্রাউনিঙের একটি দুটি নয়, পঞ্চাশটি কবিতা তর্জমা করেছেন এ-কথা শুনতেই অবাক লাগে। এই লেখকের পরিচয় তাঁর নামে নয়, তাঁর রচনায়। আপনি হয়তো মৈত্র মহাশয়ের বহু কবিতা প'ড়েও আজো তাঁর নাম জানেন না। বিভিন্ন ও বহু ছদ্মনামে বিভিন্ন ও বহু সাময়িক পত্রে গদ্যে ও পদ্যে অনেক কবিতা প্রকাশ করেছেন তিনি। তাঁর প্রধান গুণ এই যে তিনি ভালোও লেখেন, অজস্রও লেখেন; তাঁর কল্পনার কৃপণতা কি কলমের ক্লান্তি নেই। কবিতার অনুবাদেও তাঁর প্রচুর উৎসাহ; এবং একমাত্র অনুবাদ-রচনাতেই তিনি স্বনাম স্বাক্ষর করেন। অনুবাদ-শিল্পী হিসেবে এই বইখানি তাঁর প্রামাণ্য সৃষ্টি।

প্রথমেই তাঁর সাহসকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। সকল ইংরেজ কবির মধ্যে ব্রাউনিঙের যে তর্জমা হ'তে পারে এ-কথা ভাবতে আমার তো কখনো সাহস হয়নি কি হ'তো না। কেননা ব্রাউনিঙ শুধু যে মহৎ কবি তা নয়, তাঁর রচনা অত্যন্ত জটিল ও কঠিন। যে-সব কবির ব্যক্তিত্ব অত্যন্ত প্রখর, তাঁরা অনুবাদে কিছুতেই ধরা দিতে চান না; এবং ব্রাউনিঙের সর্বগ্রাসী ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পেয়েছে তাঁর মহিমায় ও মুদ্রাদোষে, প্রতিটি কথায় ও

কমা-ফুটকিতে। ব্রাউনিঙ পড়াটাই তো এক-এক সময় মানসিক মল্লযুদ্ধ, তাঁর অনুবাদ না জানি আরো কতগুণে মল্লযুদ্ধ!

কিন্তু মৈত্র মহাশয়ের এই বইখানাতে মল্লযুদ্ধের চিহ্নমাত্র নেই। এত সহজে তিনি অনুবাদ ক'রে গেছেন যে দেখে অবাক লাগে। অবশ্য তার ফলে কবিতাগুলোও অত্যন্ত সহজ হ'য়ে গেছে। এমনকি, অনেক ক্ষেত্রে না-ব'লে দিলে ব্রাউনিঙ ব'লে বুঝতেই পারতুম না। ব্রাউনিঙকে অত্যন্ত তরল ক'রে নিয়ে তরল বাঙলা পয়ারে অনায়াসে তিনি লিখে গেছেন। তারই মধ্যে চেষ্টা করেছেন মূল কবির ছন্দ মিল মোটামুটি অনুসরণ করতে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ব্রাউনিঙের রীতিবৈশিষ্ট্য কিছু ফোটেনি; অন্যদিকে, অনুবাদকের স্বাধীন কবিত্বশক্তি পদে-পদে মূলকে অনুসরণ করতে গিয়ে চাপা পড়েছে। মৈত্র মহাশয়েরই লেখা ভালো কবিতা পড়তে পেলে আমরা খুসি হতুম; কি গদ্যছন্দের রচনায় ব্রাউনিঙের ভাববস্তু আরো বেশিমাত্রায় পাওয়া গেলেও ভালো ছিলো। ব্রাউনিঙের রচনারীতি ছিলো অদ্ভুত, আশ্চর্য্য, কখনো-কখনো উৎকট; সেটা নিজস্ব ক'রে নেয়া যদি অসম্ভব, তবে নিজেরই ধরণে ভালো কবিতা তৈরি করলে ব্রাউনিঙ কি অনুবাদক কারুরই ক্ষতি হ'তো না। মনে করুন 'ঘরে-বাইরে'তে 'ক্রিস্টিনা'র প্রথম দু'লাইনের তর্জমা:

> আমায় ভালোবাসবে না সে এই যদি তার ছিল জানা
> তবে কি তার উচিত ছিল আমার পানে নয়ন হানা?

এ তো একেবারেই রবিঠাকুর, কিন্তু ভিতরের উপাদানটা ঠিকই ব্রাউনিঙের। এই পংক্তি দুটি মৈত্র মহাশয় করেছেন এই:

> উচিত ছিল না তার সে চাহনি হানা মোর 'পরে
> না ছিল বাচনা যদি প্রাণে তার মোর প্রেম তরে।

পাশাপাশি এই দুই পদ্য পড়লে আমার অর্থ স্পষ্ট হবে। তারপর মূল ব্রাউনিঙের সঙ্গে খানিকটা তুলনা ক'রে দেখা যাক। নিচের এই কবিতাটি আমাদের সকলেরই অতি পরিচিত:

> Escape me?
> Never—
> Beloved!
> While I am I, and you are you.
> So long as the world contains us both,
> Me the loving and you the loth.

মৈত্র মহাশয়ের অনুবাদ:

> আমারে এড়াবে তুমি ভেবেছ কি মনে?
> —কভু নয়, জেনো এ জীবনে।
> যতদিন ভবে
> আমি র'ব আমি, আর তুমি তুমি র'বে,
> —আমার অনুসরণ, পলায়ন তোমার সতত,
> তুমি বিমুখিনী নারী, প্রেমাকুল আমি অবিরত।

ইভেলিন হোপ্-এর প্রথম দু' লাইন:

> Beutiful Evelyn Hope is dead!
> Sit and watch her side an hour.

অনুবাদে হয়েছে এই:

> সে যে হায় নাই আর! সুকুমার ফুলের মতন
> ছিল যার মুখখানি, হরিল সে কুমারী রতন
> মরণ আপন হাতে। বসে আছি শবদেহ পাশে।

ব্রাউনিঙ যদি আজো বেঁচে থাকতেন এবং যদি তিনি বাঙলা পড়তে পারতেন তাহ'লে এই তর্জমা প'ড়ে তাঁর কী মনে হ'তো জানিনে। কাব্যের 'বিষয়' তো মোটামুটি সব কবিতেই এক, বলবার ভঙ্গিতেই বিশেষত্ব। ব্রাউনিঙ যদি বাঙালি হতেন তাহ'লে 'বিমুখিনী নারী' 'কুমারীরতন' গোছের মরচে-পড়া শব্দ কখনোই তাঁর কলমে আসতো না; 'সে যে হায় নাই আর!' ব'লে শোক-গাথার সূত্রপাতও তিনি করতেন না। ব্রাউনিঙের প্রধান বিশেষত্ব এইখানেই যে তাঁর কাব্যের ধরণ ছিলো ঠিক কথা বলার ধরণ; একদিকে

তাঁর শব্দসম্পদ যেমন বিশাল ও অসাধারণ ছিলো তেমনি অতি গভীর অতি সূক্ষ্ম কবিতাও ছোট-ছোট জীবন্ত কথায় একেবারে চলতি ইংরিজিতে তিনি লিখেছেন। একজন আর-একজনের কাছে বলছে: 'তাঁর প্রায় সব কবিতার ছাঁচই এই। ছাঁচটা গীতিকবিতার নয়, নাটকীয় কবিতার। এই নাটকীয়তা মৈত্র মহাশয়ের অনুবাদে সঞ্চারিত হয়নি। পর্ফিরিয়াজ লভার-এর রুদ্ধশ্বাস, অসহ্য ব্যাকুলতা ঢিমে তালের ছন্দে কাটা-কাটা শ্লোকে 'মিষ্টি' প্রেমের কবিতায় পরিণত হয়েছে। জেমস্ লী আমি বরাবর অতি দুরূহ কবিতা ব'লে ভয় ক'রে এসেছি, এই বইয়ে তারও অনুবাদ দেখে রীতিমত অবাক হ'য়ে গেলুম। কিন্তু—

আজি সাগরের তীরে অতি ক্ষুদ্র এ কুটীরে
মোরা দোঁহে লভেছি কুলায়।
হানে হিম শিহরণ পউষের প্রভঞ্জন,
অগ্নিকুণ্ড আতপ বিলায়।
পুড়িছে কি এ অনলে, ডুবিল যা সিন্ধুজলে
ভগ্নকাষ্ঠ সে মগ্ন-তরীর?
নৌকাডুবি এই কূলে হ'ল কত যাই ভুলে
হয়ত অতলে মোর নীড়।

প্রাক্-রবীন্দ্র কি বালক-রবীন্দ্র যুগের বাঙালা কবিতার এই চমৎকার উদাহরণের সঙ্গে মনে হয় কি নিচের ইংরিজি লাইনগুলোর কোনো সম্পর্ক আছে?

Is all our fire of shipwreck wood,
Oak and pine?
Oh, for the ills half-understood,
The dim, dead woe
Long ago
Befallen this bitter coast of France!
Well, poor sailors took their chance,
I take mine.

মোটের উপর, ব্রাউনিঙ পঞ্চাশিকায় ব্রাউনিঙই যেন অনুপস্থিত। কোনো-কোনো কবিতা খানিকটা কাছে আসতে পেরেছে সেটা মৈত্র মহাশয়ের কৃতিত্ব; মূল ব্রাউনিঙ যে পড়েনি হয়তো এ-বই প'ড়ে সে খুসি হ'তে পারে, কিন্তু ব্রাউনিঙকে কিছু পেলো এ-কথা ভাবলে সে ভুল করবে। এই অনুবাদগুলোয় ব্রাউনিঙের প্রকৃত আস্বাদ পাওয়া যাবে না এ-কথা মৈত্র মহাশয়ের মত রসজ্ঞ ব্যক্তি নিজেই বুঝতে পেরেছেন নিশ্চয়ই। ব্রাউনিঙের রস ও সুর বজায় রেখে তর্জমা করা এতই কঠিন কাজ যে তার চেষ্টাতেও গৌরব। যেটাকে এখন পর্য্যন্ত অসম্ভবই বলতে হয়, সেটা সম্ভব করতে পারেননি ব'লে মৈত্র মহাশয়কে দোষ দেয়া অন্যায় হবে; এবং তাঁর এই দুরূহ চেষ্টার জন্য যথাযোগ্য ধন্যবাদ নিশ্চয়ই তাঁর প্রাপ্য। কোনো একজন বিশেষ বিদেশী কবিকে মাতৃভাষায় মোটামুটি সমগ্রভাবে প্রকাশ করবার চেষ্টা বাঙলাভাষায় এই বোধ হয় প্রথম। এই বই প্রকাশ ক'রে মৈত্র মহাশয় শুধু যে নিজের অসাধারণ কাব্যপ্রীতির পরিচয় দিয়েছেন তা নয়; অনুবাদের দিকে অনেক মূল্যবান কাজের ক্ষেত্র বাঙলা কাব্যে প'ড়ে আছে সে-কথাও আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন।

শ্যামলী। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী, এক টাকা।

সম্প্রতি এক বাঙলা মাসিকপত্রের পৃষ্ঠায় এক 'সমালোচক' আমাদের জানিয়েছেন: 'রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা বাঙলাদেশের সকল কবিই নিকৃষ্ট—এত নিকৃষ্ট যে তুলনা বাতুলতা।' বস্তুত, রবীন্দ্রনাথ নাকি এতই উৎকৃষ্ট কবি যে গদ্যকবিতারূপ 'কচুরিপানা'ও তাঁর হাতে ফুল হ'য়ে ফোটে। তারই দু' একটি ফুলের সন্ধান এই 'সমালোচক' ভদ্রলোক নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও শ্যামলীতে পেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ নাকি শ্যামলী প্রভৃতি বই লিখেছেন 'এই কথা ঘোষণা করিবার জন্য—"ইহা না লেখাই ভালো, কিন্তু যদি নিতান্তই লিখিতে হয়, এই ভাবে লিখিয়ো।"

গদ্য কবিতা 'যাহার একটুমাত্র লিখিবার ক্ষমতা আছে সেই লিখিতে পারে', কিন্তু 'সমালোচনা' লিখতে হ'লে 'একটুমাত্র' লেখবার ক্ষমতাও দরকার করে না সেটা নিঃসংশয়ে বুঝতে পারলুম। এমনকি, সামান্যতম

বোধশক্তিও না থাকলে তো চলেই, উপরন্তু না-থাকাই ভালো। যে-গদ্যকবিতা 'কাব্যজগতের অপসৃষ্টি' তারই একটি উদাহরণ উদ্ধৃত ক'রে 'সমালোচক' মন্তব্য করেছেন 'অত্যন্ত সুন্দর'। তার কারণ? কারণ তিনি নিজেই জানিয়েছেন: লেখক রবীন্দ্রনাথ। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ যখন লিখেছেন তখন তাঁকে বাহবা দেবার জন্য 'সংযম' 'সংহতি' প্রভৃতি শব্দ কলমের মুখে তৈরিই আছে। অন্যান্য অতি 'নিকৃষ্ট' কবিদের হাতে গদ্যকবিতা হ'লো রাশি-রাশি রাবিশ, শুধু রবিঠাকুরের হাতেই ভালো। রবিঠাকুরের হাতে ভালো হ'লো কেন? বাঃ, হবে না, রবিঠাকুর যে! হিজ মাস্টার্স ভয়েস কানে গেলে চিত্ত চমৎকৃত না-হ'য়ে পারে!

'প্রভু, তোমার সৃষ্টি বুঝতে পারিনে, ক্ষমা করো,' এই কাতর উক্তি ক'রে পায়ে লুটিয়ে পড়াটা যখন বাঙলাদেশের একটি প্রসিদ্ধ পত্রিকার পৃষ্ঠায় 'সমালোচনা' নামে চলতে দেখি তখন, আর কিছু না হোক, এর প্রকাশ্য নির্লজ্জতাতেই স্তম্ভিত হ'তে হয়। এই ধরণের বুকে-হাঁটা ভঙ্গিতে প্রভুর গৌরব কিছু বাড়ে না, দর্শকেরাও লজ্জিত হয়। এই 'সমালোচকে'র মারফৎ জানতে পেলুম যে 'পত্রপুটের ও শ্যামলীর কবিতাগুলির বৈশিষ্ট্য এইখানেই—তাহারা মুখর নহে।' আমি হাজার লোকের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে জোর ক'রেই বলবো যে গদ্যে কি পদ্যে রবীন্দ্রনাথের কবিতার প্রধান বিশেষত্ব ও প্রধান **গুণই** এই যে তারা মুখর; নদীর স্রোত যেমন মুখর, হাওয়ায় যেমন মুখর অরণ্য। রবীন্দ্র-কাব্যকে 'সংহত ও সংযত' বলা অতি নির্বোধ চাটুবাক্য, কেননা 'সংহত ও সংযত' হওয়াই যে কাব্যের একমাত্র মহিমা তা তো নয়। হুইটম্যানের কি সুইনবর্নের কি শেলির স্তুতি করতে গিয়ে কেউ কি তাঁদের 'সংযম ও সংহতি'র তারিফ করে? বরঞ্চ এঁদের—এবং রবীন্দ্রনাথের—রচনার বিশাল দুর্নিবার উচ্ছ্বাসই কোনো-কোনো রুচিতে হয়তো ঠিক সহ্য হয় না। মানসী থেকে আরম্ভ ক'রে বলাকা পর্যন্ত, তারপর এই পরবর্তী সমস্ত কাব্যগ্রন্থগুলি মনে-মনে ভেবে দেখুন: বার-বার এ-কথাই মনে হবে যে রবীন্দ্রনাথ একবার বলতে আরম্ভ করলে সহজে আর থামতে পারেন না,

নিজের আবেগের ঝোঁকে কূল ছাড়িয়ে চ'লে যান বন্যার নদীর মতো। অতি সূক্ষ্মভাবে দেখলে, এতে হয়তো তাঁর বিশেষ কোনো-কোনো কবিতার ক্ষতিও হয়েছে। কিন্তু এ-জন্য রবীন্দ্রনাথকে দোষ দেয়া আর তিনি রবীন্দ্রনাথ হ'লেন ব'লে তাঁকে দোষ দেয়া একই কথা। প্রত্যেক কবিকে তাঁর নিজের সর্ত-অনুসারেই স্বীকার ক'রে নিতে হয়; ব্যক্তিগত পছন্দমত কাটছাট করতে গেলে হয়তো হারাতে হয় কবির সারবস্তুকেই। সমগ্রভাবে না নিলে কোনো কবিকেই বোঝা যায় না; যেটা কখনো-কখনো মনে হবে কবির দুর্বলতা, সেটাই যে তাঁর মহিমারও উৎসস্থল, এ-কথা সমগ্রভাবে তাঁর রচনা পড়লেই বোঝা যায়।

'এই সকল নিকৃষ্টতর কবিদেরও অনেকেই যথেষ্ট উপভোগ্য কবিতা লিখিয়া থাকেন এবং রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আবাল্য পুষ্ট হইয়াও এই সকল কবিতার সমাদরে বিদগ্ধজনের ব্যাঘাত ঘটে না।' কিন্তু, মুখর নয় ব'লে পত্রপুট শ্যামলীর তারিফ করেছেন যে-'সমালোচক,' তিনি কোনোদিন রবীন্দ্রনাথের, এমনকি 'নিকৃষ্টতর' কবিদেরও রচনা প'ড়ে বুঝেছেন কিনা সন্দেহ করি। দাস-মনোভাবের এমন চমৎকার দৃষ্টান্ত সত্যি বিরল। কবিদের 'উৎকৃষ্টতা' মাপবার ফিতে তাঁদের পকেটেই থাকে যাঁরা নিকৃষ্টতম কবিও নন; এবং এই ধরণের মূঢ় চাটুকারিতা রবীন্দ্রনাথকেই হাস্যকর করে, এটাই সব চেয়ে বড় দুঃখ।

গদ্য-কবিতা অনেকেই এখনো বোঝেন না কি বুঝতে চান না; এবং না বুঝে, কি ইচ্ছে ক'রে না বুঝে অনেক অসংলগ্ন অর্থহীন কথা বলেন। এঁদের মধ্যে কারো মতামতে যদি সততা থাকে সেটা অশ্রদ্ধেয় নয়। গদ্য কবিতার উপর যদি কারো সত্যিকারের অবিশ্বাস থাকে, সেটা রবীন্দ্রনাথের রচনা পর্যন্ত প্রসারিত না-হবার কোনো কারণ নেই। কেননা যে-জিনিসটাই মেকি, সেটা রবীন্দ্রনাথ লিখলেও মেকি—বিশেষ ক'রে বাঙলায় রবীন্দ্রনাথই যখন সেটা প্রথম চালালেন। আর যদি তাতে কিছু থাকে, সেটা রবীন্দ্রনাথের রচনাতেও যেমন আছে, অন্যান্য কি অন্য কোনো-কোনো কবিতেও আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু এই 'সমালোচক' গদ্য-কবিতার

বৈধ অস্তিত্বই স্বীকার করেন না, এদিকে রবীন্দ্রনাথের নাম উঠলেই নমো হে নমো। প্রভুর কণ্ঠস্বর শোনামাত্র জিভ দিয়ে কী-রকম লালা গড়াতে থাকে সে একটা দেখবার জিনিস। রীতিমত পাভলোভের কথা মনে করিয়ে দেয়। গদ্য-কবিতা কী-রকম হওয়া উচিত সেটা দেখাবার জন্যেই রবীন্দ্রনাথ এ-সব কবিতা লিখেছেন এ-উক্তিও টেঁকসই নয় যেহেতু এই দৃষ্টান্ত দেখে অন্য যে-কেউ লিখলে সেটা তক্ষুনি 'কচুরিপানা' হবে, কেননা তার লেখক তো রবীন্দ্রনাথ নন। পত্রপুট শ্যামলী যে ভালো, এর তো আর কোনো কারণ নেই; একমাত্র কারণ এই যে লেখক রবীন্দ্রনাথ।

আমি নিজে গদ্য-কবিতায় অসংশয়েই আস্থাবান। সকলেই তা হবেন, এখন পর্য্যন্ত সেটা আশা করিনে; কিন্তু এই ধরণের কাপুরুষ কপটতা ও হাঁটু-ভাঙা স্তাবকতা দেখলে ধৈর্য্য থাকে না। বাঙলা কাব্যে এই গদ্য-কবিতার প্রতিষ্ঠা একদিন হবে সকল তর্কের অতীত, এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস। অবশ্য কালক্রমে এর নব-নব বিকাশ হবে নতুন কবিদের হাতে; এখনই তো দেখা যাচ্ছে সকলের হাতে গদ্য-কবিতা এক স্বরে বাজছে না। শস্তা অনুকরণের প্রাচুর্য্য দেখে ভীত হবার কিছু নেই; সেটা অনিবার্য্য ও অবজ্ঞেয়। গদ্য-কবিতা যে স্থায়ী ও মূল্যবান তার একটা প্রমাণ এই যে তার রচনাভঙ্গির প্রভাব পড়েছে আমাদের পদ্যের উপরেও। পদ্যের শক্ত, আত্ম-সচেতন, ইস্ত্রি-করা পোষাকি ভাবটা ক্রমেই কেটে যাচ্ছে, অনেক এগিয়ে এসেছে মুখের ভাষার দিকে। রবীন্দ্রনাথের সাম্প্রতিক পদ্যে এবং আধুনিক কবিদের পদ্যরচনায় এ-জিনিসটা বিশেষ ক'রে লক্ষ্য করবার।

গদ্য-কবিতা ইংরিজিতে অনায়াসে মেনে নিতে পারি, কিন্তু বাঙলায় তাকে কিছুতেই আমল দেবো না, এটা আমাদের জাতিগত দাসত্বেরই একটা দৃষ্টান্ত হিসেবে নিতে হবে। ভালো লাগা কি ভালো না-লাগা দিয়েই কথা; ভালো যদি লাগলো সেখানেই তো মিটলো তর্ক। কিন্তু অনেকে হয়তো সহজ ভালো লাগাকে জোর ক'রে ঠেকিয়ে রেখে তাত্ত্বিক

তর্ক তোলেন, নাম নিয়ে ঝগড়া বাধান। শ্যামলীর অন্তর্গত 'শেষ পহরে' কি 'বঞ্চিত' যাঁর ভালো না লাগবে, কোনো কবিতাই বোধ হয় তাঁর ভালো লাগে না। এই ধরণের নাটকীয় কবিতা—আমাদের অতিপরিচিত জীবনের ছোট-ছোট ছবি—গদ্য-কবিতায় রবীন্দ্রনাথের ঝোঁকটা খুব বেশি ক'রেই এইদিকে। যেন জীবনের কত ছেঁড়া পাতা বিস্মৃতির হাওয়ায় উড়ে যেতে-যেতে কবির কল্পনায় আটক প'ড়ে গেছে। পুনশ্চ পরিশেষ উভয় গ্রন্থেই এই জাতীয় রচনার ভাণ্ডার। পলাতকার মত সম্পূর্ণ ও নিটোল গল্প নয়; একটুখানি গল্পকে ঘিরে মস্ত উজ্জ্বল ভাবমণ্ডল। 'সম্ভাষণ' ও 'অকালঘুম' এ দুটি কবিতাও সেই জাতের। 'যাকে খুব জানি তাকেও সব জানিনে এই কথা ধরা পড়ে কোনো একটা আকস্মিকে', যেমন হঠাৎ চোখে পড়ে প্রিয়ার প্রসাধন কি দেখা যায় তাকে অসময়ে সকালবেলায় ঘুমোতে, এক-একটি আশ্চর্য্য মুহূর্ত্তে যেন সমস্ত জীবনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা উন্মোচিত। এ ছাড়া, শ্যামলীর লিরিক জাতীয় কবিতা-গুলোয় পড়েছে পড়ন্তবেলার রোদ্দুরের ঝিকিমিকি; সত্যি বলতে, পূরবী থেকে আরম্ভ ক'রে রবীন্দ্রনাথের বেশির ভাগ গীতিকবিতার মূল কথা হচ্ছে 'মনে পড়ে।'

এ কান্না নয়, হাসি নয়, চিন্তা নয়, তত্ত্ব নয়,
যত কিছু ঝাপসা-হয়ে-যাওয়া রূপ,
ফিকে-হয়ে-যাওয়া গন্ধ,
কথা-হারিয়ে-যাওয়া গান,
তাপহারা স্মৃতিবিস্মৃতির ধূপছায়া,
সব নিয়ে একটি মুখ-ফিরিয়ে-চলা স্বপ্নছবি···।

প্রশান্তি নেমেছে কবির চিত্তে, অতল অকূল প্রশান্তি, দীর্ঘ কবিজীবনের শেষ পুরস্কার। যেন বিকেলের আকাশের বুকের মধ্যে একটি নিঃশব্দ গভীর দৃষ্টি পাখির মতো ডানা মেলে উড়ে চ'লে যাচ্ছে;

তোমরা এসেছ তর্ক নিয়ে।
আজ দিনান্তের এই পড়ন্ত রোদ্দুরে
সময় পেয়েছি একটুখানি ;
এর মধ্যে ভালো নেই মন্দ নেই,
নিন্দা নেই খ্যাতি নেই।
দ্বন্দ্ব নেই, দ্বিধা নেই,
আছে বনের সবুজ,
জলের ঝিকিমিকি,—
জীবনস্রোতের উপরতলে
অল্প একটু কাঁপন, একটু কল্লোল,
একটু ঢেউ।
আমার এই একটুখানি অবসর
উড়ে চলেছে
ক্ষণজীবী পতঙ্গের মতো
সূর্য্যাস্তবেলার আকাশে
রঙীন ডানার খেলা শেষ করতে
বৃথা প্রশ্ন কোরো না।

এই বিরতি, এই অপরূপ সোনালি অবসর কথা ক'য়ে উঠেছে নানা সুরে নানা পরিবেষে কবির সমস্ত আধুনিক কাব্যে। শ্যামলী এর ব্যতিক্রম নয়। 'আমি' কবিতায় 'ব্যক্তিত্বহারা অস্তিত্বের গণিততত্ত্বে'র বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত অনুভূতির অফুরন্ত রঙিন ঐশ্বর্য্যকে তিনি দাঁড় করিয়েছেন। এ সমস্যা মুখ্যত আধুনিক। সকল প্রশ্ন তিনি এড়াতে চান, কিন্তু প্রশ্ন তাঁকে হানা দেবেই, যেহেতু তাঁর মন প্রশান্ত হ'লেও অসাড় নয়, অতীতের স্মৃতিমর্ম্মরিত হ'লেও বর্ত্তমান সম্বন্ধে নিরপেক্ষ নয়। তাঁর মনীষার তীব্র সচেতনতা এখনো দেখা যাচ্ছে কত নতুন-নতুন কথায় ও উপমায়, কাব্যের কত নতুন প্রকাশভঙ্গিতে, কত নবাগত সমস্যার অঙ্গীকরণে।

মন তাঁর অবিশ্রাম গতিশীল ; গীতাঞ্জলির গভীর আত্মস্থতায় এখনো নিশ্চিন্ত থাকলে এ-প্রশ্ন তিনি করতেন না—

পণ্ডিত বলছেন—
বুড়ো চন্দ্রটা, নিষ্ঠুর চতুর হাসি তার,
মৃত্যুদূতের মতো গুঁড়ি মেরে আসছে সে
পৃথিবীর পাঁজরের কাছে।...
তখন বিরাট বিশ্বভুবনে
দূরে দূরান্তে অনন্ত অসংখ্য লোকে লোকান্তরে
এ বাণী ধ্বনিত হবে না কোনোখানেই—
"তুমি সুন্দর"
"আমি ভালোবাসি।"
বিধাতা কি আবার বসবেন সাধনা করতে
যুগ-যুগান্তর ধ'রে,
প্রলয়-সন্ধ্যায় জপ করবেন,—
"কথা কও, কথা কও,"
বলবেন, "বলো, তুমি সুন্দর,"
বলবেন, "বলো, আমি ভালোবাসি?"

এ-ই তো প্রশ্ন। এবং এ-প্রশ্নের উত্তর রবীন্দ্রনাথের মুখেও আজ নেই।

বুদ্ধদেব বসু

চিঠি-পত্র

মিহিজাম,
২৩শে জানুয়ারী, ১৯৩৭।

"কবিতা" সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

সবিনয় নিবেদন,

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ যখন বলছেন যে, যেটা কাব্য সেটা পদ্যে হলেও কাব্য গদ্যে হলেও কাব্য, তখন বিতর্ক শোভা পায় না। এখন কেবল একটি জিজ্ঞাসা থাকে।

রবীন্দ্রনাথের "বিচিত্র প্রবন্ধ," "ছিন্নপত্র," "গল্পগুচ্ছ," "ঘরে বাইরে" ইত্যাদি অসংখ্য গদ্যগ্রন্থে এমন অংশ কি হাজার দশেক নেই যাকে কেটে নিয়ে পদ্যের মত করে ছাপলে আরো পঞ্চাশখানা "পুনশ্চ" তৈরি হয়, যাকে তর্জমা করে পদ্যের মত করে সাজালে আরো অনেকগুলি ইংরাজী "গীতাঞ্জলি"!

রবীন্দ্রনাথ কেন, বঙ্কিমচন্দ্র শরৎচন্দ্র মণীন্দ্রলাল বিভুতিভূষণ অচিন্ত্যকুমার বুদ্ধদেব প্রেমেন্দ্র প্রবোধকুমার প্রভৃতির গদ্য কি স্থলে স্থলে কাব্যের পর্য্যায়ে পদার্পণ করেনি। সাজাতে জানলে বহু সহস্র কবিতা কি আজই বাংলা কবিতার চয়নিকায় সন্নিবিষ্ট হয় না।

আমি ত দেখছি পদ্যের অনুকরণে সাজানো ছাড়া আধুনিক কবিতার অন্য কোনো বৈশিষ্ট্য নেই যা পুরাতন গদ্যের ছিল না। পদ্যের অনুকরণে সাজানো বলেই এই জিনিষ কবিতা বলে কাটছে, ঐ অনুকরণটুকু ছাড়লে এর বৈশিষ্ট্য অবশিষ্ট থাকে না।

কাব্যরসের দিক থেকে বিচার করলে ল্যাম্, লী হাণ্ট, ডি কুইন্সি, পেটার, রাস্কিন যত শত প্রবন্ধ লিখেছেন তার অধিকাংশই কবিতা।

অথচ কোনো ইংরাজি কাব্যসঙ্কলনে তাঁদের দর্শন পাওয়া যায় না। হয়ত ল্যামের দুই একটি মাঝারি পদ্য দেওয়া থাকে।

"সঞ্চয়িতা"র পরবর্ত্তী সংস্করণে আশা করি "বিচিত্র প্রবন্ধ," "ছিন্নপত্র" ও "গল্পগুচ্ছ" থেকে কিছু কিছু ও "লিপিকা" থেকে বেশী বেশী "কবিতা" থাকবে। ইতি।

বিনীত
লীলাময় রায়

পুনশ্চ—
রবীন্দ্রনাথ "গদ্যকাব্য" নামে একটি কথা ব্যবহার করেছেন। পদ্যে যা লেখেন তা কি "পদ্যকাব্য ?"

সম্পাদকীয় মন্তব্য :—কবিতা যখন গদ্যেও হ'তে পারে, পদ্যেও হ'তে পারে তখন গদ্য-কাব্য কথাটার বৈধ প্রয়োজন আছে। পদ্যকে পদ্য-কাব্য বললে ভুল হয় না, হয়তো বাহুল্য হয়, যদিও পৃথিবীতে অনেক পদ্যই দেখা গেছে যেটা কাব্য নয়। এমন অনেকে আছেন যাঁরা সেই শ্রেণীর পদ্যকে অনায়াসেই কবিতা ব'লে মানেন, মানেন না লিপিকাকে। কিন্তু লিপিকার রচনাগুলি কবিতাই, লীলাময়ের কূট কোটেশন-মার্কা সত্ত্বেও। রবীন্দ্রনাথ নিজেই স্বীকার করেছেন যে ওগুলো কবিতার মতো ক'রে সাজাতে চেয়েও শেষ পর্য্যন্ত সাহসে কুলিয়ে ওঠেনি। অবশ্য সাজানোতে কিছু এসে যায় না। গদ্য কবিতা গদ্যের মতো ক'রেই সাজানো হ'তে পারে, সেই সঙ্গে কবিতাও হ'তে পারে। ইংরেজি সাহিত্যে এর দৃষ্টান্তের অভাব নেই।

তবে ছিন্নপত্র কি পয়লা নম্বর কবিতা হবে না কেন? হবে না এই কারণে যে ছিন্নপত্র চিঠি এবং পয়লা নম্বর গল্প। উভয় রচনাতেই যথেষ্ট কাব্যবস্তু আছে, কিন্তু সমগ্র জিনিসটা যে কবিতা নয় এটাও কি ব'লে দিতে হবে? ল্যাম ডিকুইন্সির রচনা সম্বন্ধেও সেই কথা। তাঁদের রচনায় কবিত্বের অভাব নেই; কিন্তু তাই ব'লে তা থেকে এমন অংশ হয়তো খুব বেশি বার করা যাবে না, যাকে (সাজাবার কায়দা সত্ত্বেও) অভিজ্ঞ পাঠকের একটি কবিতা ব'লে ভুল হবে। থাকবে না রূপের সম্পূর্ণতা, থাকবে না রসের সমগ্রতা। তাঁদের রচনা থেকে উদ্ধৃতি না দেবার

জন্যে অক্সফোর্ড বুক অব ইংলিশ ভর্সের সম্পাদককে দোষ দেয়া যায় না। * কিন্তু দোষ নিশ্চয়ই দেয়া যায় বাইবলের সং অব সংস নেই ব'লে, হুইটম্যানের ও ক্যাপ্টেন মাই ক্যাপ্টেন ছাড়া বিশেষ কিছু নেই ব'লে। কেননা সলোমনের কি হুইটম্যানের গান কল্পনায় ও প্রেরণায় সর্বোপরি নির্মাণ-কৌশলে ও রচনা-বিন্যাসে সম্পূর্ণ ও অখণ্ড কবিতা, এ-বিষয়ে সন্দেহ তাঁরাই করবেন যাঁরা কবিতা বলতে নেহাৎই পদ্য বোঝেন।

সম্প্রতি ইয়েট্‌স্ সম্পাদিত একটি চয়নিকায় ইংরিজি গীতাঞ্জলি স্থান পেয়েছে। ইংরিজি গীতাঞ্জলিকে আমরা তো কবিতা ব'লেই জানি, মূলের চাইতে তার মূল্য একটুও কম ধরি না, যদিও বাঙলা রচনাগুলি পদ্য, তার উপর গান, এবং ইংরিজিটা গদ্য এবং গদ্যের মতোই সাজানো। একটা জিজ্ঞাস্য : ইংরিজি গীতাঞ্জলিকে লীলাময় কি কবিতা ব'লে মানেন না? হুইটম্যানকে কবি ব'লে? পাউণ্ড, এলিয়ট, এইচ-ডি, ডি এইচ্ লরেন্সকে? পাউণ্ডের চীনে কবিতাগুলো কি তাঁর কাছে কবিতা ব'লে মনে হয় না? যদি হয়, তাহ'লে ইংরিজিতে যেটা হ'তে পারলো বাঙলায় সেটা হ'তে পারবে না কেন? আর যদি না হয়, যদি তিনি কবিতা বলতে নেহাৎই শুধু পদ্য বোঝেন, তাহ'লে তো এই আলোচনারই কোনো দরকার ছিলো না। এই ডিমক্রেসির যুগে প্রত্যেকেরই স্বীয় মতে অধিকার আছে, সে-মত যদি এও হয় যে ইংরিজি গীতাঞ্জলি কবিতা নয়!

* এ-প্রসঙ্গে এটা অবশ্য উল্লেখযোগ্য যে ইয়েট্‌স্-এর সদ্য-প্রকাশিত অক্সফোর্ড বুক অব মডার্ন ভর্সের প্রথম কবিতা হচ্ছে পেটারের দা ভিঞ্চি প্রবন্ধ থেকে মোনা লিসা সম্বন্ধে বিখ্যাত কয়েকটি লাইন—পদ্যের মতো সাজানো। লীলাময় নিশ্চয়ই সেটা লক্ষ্য করেছেন?

সম্পাদক : বুদ্ধদেব বসু : প্রেমেন্দ্র মিত্র : সহকারী সম্পাদক : সমর সেন
৫ ও ৬ চিন্তামণি দাস লেন শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস হইতে প্রভাতচন্দ্র রায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কবিতা

দ্বিতীয় বর্ষ আষাঢ়, ১৩৪৪ চতুর্থ সংখ্যা

স্মরণ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যখন রবো না আমি মর্ত্যকায়ায়
তখন স্মরিতে যদি হয় মন
তবে তুমি এসো হেথা নিভৃত ছায়ায়
যেথা এই চৈত্রের শালবন।
হেথায় যে মঞ্জরী দোলে শাখে শাখে
পুচ্ছ নাচায়ে যত পাখী গায়,
ওরা মোর নাম ধ'রে কভু নাহি ডাকে
মনে নাহি করে ব'সে নিরালায়।
কত যাওয়া কত আসা এই ছায়াতলে
আনমনে নেয় ওরা সহজেই
মিলায় নিমেষ যত প্রতি পলে পলে
হিসাব কোথাও তার কিছু নেই।
ওদের এনেছে ডেকে কোন্ সমীরণে
ইতিহাস-লিপিহারা যেই কাল
আমারে সে ডেকেছিল কভু খনে খনে
রক্তে বাজায়েছিল তারি তাল।

সেদিন ভুলিয়াছিনু কীর্ত্তি ও খ্যাতি
বিনাপথে চলেছিল ভোলা মন,
চারিদিকে নামহারা ক্ষণিকের জ্ঞাতি
আপনারে করেছিল নিবেদন।
সেদিন ভাবনা ছিল মেঘের মতন
কিছু নাহি ছিল ধরে রাখিবার,
সেদিন আকাশে ছিল রূপের স্বপন,
রং ছিল উড়ো ছবি আঁকিবার।
সেদিনের কোনো দানে ছোটো বড়ো কাজে
স্বাক্ষর দিয়ে দাবী করি নাই,—
যা লিখেছি যা মুছেছি শূন্যের মাঝে
মিলায়েছে, দাম তার ধরি নাই।
সেদিনের হারা আমি,—চিহ্ন বিহীন
পথ বেয়ে কোরো তার সন্ধান,
হারাতে হারাতে যেথা চলে যায় দিন,
ভরিতে ভরিতে ডালি অবসান।
মাঝে মাঝে পেয়েছিনু আহ্বান পাঁতি
যেখানে কালের সীমা-রেখা নেই,—
খেলা করে চলে যায় খেলাবার সাথী
গিয়েছিনু দায়হীন সেখানেই।

১

দিই নাই, চাই নাই রাখিনি কিছুই
ভালোমন্দের কোনো জঞ্জাল,
চলে-যাওয়া ফাগুনের ঝরা ফুলে ভূঁই
আসন পেতেছে মোর ক্ষণকাল।
সেইখানে মাঝে মাঝে এল যারা পাশে
কথা তারা ফেলে গেছে কোন্ ঠাঁই;
সংসার তাহাদের ভোলে অনায়াসে,
সভাঘরে তাহাদের স্থান নাই।
বাসা যার ছিল ঢাকা জনতার পারে,
ভাষাহারাদের সাথে মিল যার,
যে-আমি চায়নি কারে ঋণী করিবারে,
রাখিয়া যে যায় নাই ঋণভার।
সে-আমারে কে চিনেছ মর্ত্ত্যকায়ায়,
কখনো স্মরিতে যদি হয় মন,
ডেকো না ডেকো না সভা, এসো এ ছায়ায়
যেথা এই চৈত্রের শালবন॥

টপ্পা-ঠুংরি

(শ্রীসমর সেন-কে)

বিষ্ণু দে

তোমার পোস্টকার্ড এল,
যেন ছড়টানা স্রোতে
পিৎসিকাটোর আকস্মিক ঘূর্ণী,
রেডিওর ঐক্যতানে বিস্মিত আবেগ।

দিন কাট্‌ল
যেন জিল্‌হাবিলম্বিতে।
গানের কলির অলিতে গলিতে
বাস্‌ গেল, ক্লাস্‌ গেল কালের জয়যাত্রায় কেটে।
জাঁদরেল প্রোফেসরের মাথায় নাম্‌ল
ব্যঙ্গাতীত ক্ষমার আকাশে প্রথম করুণার আশীর্ব্বাদ।
কাব্যেই হল করুণা; করুণায় কাব্য
সেইদিন প্রথম।

নাম্‌ল সন্ধ্যা,
সূর্য্যদেব, এখানে নাম্‌ল সন্ধ্যা,
কবিতার সন্ধ্যা
পিলু বারোয়ার সন্ধ্যা।
একাকার এই ম্লান মায়ায়
জাগরহৃদয়ের গোধূলিলগ্নে
শুধু নীলাভ একটু আলো এল
তোমার পোস্টকার্ড,
আর এল তোমার ট্রেনের অস্পষ্ট দূরাগত ডাক।

সূর্য্যদেব, এর পূরবী ওর বিভাসকে আশীর্ব্বাদ করে' চলে'
যাক্‌।

বাসের একি শিংভাঙা গোঁ!
যন্ত্রের এই খামখেয়াল!
এদিকে আর পঁচিশমিনিট—
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর।
স্বেচ্ছাতন্ত্র ছেড়ে দ্বৈরাচারী ট্রামই ভালো,
ইচ্ছার দায়িত্বহীনতা ছেড়ে সংস্কারের বাঁধা সড়ক।

বড়োবাজারের উপলউপকূলে
জনগণের প্রবল স্রোত
উগারিছে ফেনা
আর বিড়ির আর সিগারেটের আর উনুনের আর মিলের ধোঁয়া
আর পানের পিক্‌
আর দীর্ঘশ্বাস
বড়োবাবুর গঞ্জনায়
বড়োসাহেবের কটা চোখের ব্যঞ্জনায়
দাম্পত্যমিলনের শ্রান্ত সম্ভাবনায়
অপত্যাধিক্যের অনুশোচনায়
ট্রামের বাসের কারের ফেরিওয়ালার রলরোলে
এই ক্লাইভ্‌ ডাল্‌হৌসি লায়ন্‌স্‌ রেঞ্জের ডেলিপ্যাসেঞ্জারদের
ক্লান্ত নীরবতায়
তিক্ত গুঞ্জনে
শুধু অস্পষ্ট একটা বিরাট লাগ্‌ডাঁট আওয়াজ
যেন শিশিরভেজা মাটিতে পাতাঝরার গান
বা যেন একটা বিরাট অতনু দীর্ঘশ্বাস
বড়োবাজারের ক্ষতবিক্ষত কিন্তু অমর আকাশে
তারায় তারায় কাঁপন লাগে যার মীড়ে মীড়ে।

নিতে হল ট্যাক্সি।
নতুন ব্রিজে কি ট্রামলাইন পাতবে ওরা ?

হে বিরাট নদী !
স্টীমারের বাঁশী
খালাসীর গান
সবপেয়েছির দেশে
ককেনের দেশে
যত কিছু বই ছিল সব পড়ার শেষে
ক্লান্ত রক্তের বিবর্ণ আবেশে
স্টীমারের বাঁশী
আর খালাসীর গান !

ট্র্যাফিক্‌ থম্‌কে দাঁড়ায়, হোঁচট খায়
বেতালা, বেসুরো, মিলের, কলের, চোঙার ধোঁয়ায়
পণ্টুনের ফাঁকে ফাঁকে শিরশিরে হাওয়ায়
আলোয় ঝিকিমিকি জলস্রোতে।
জনস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধনমান,
আশে আর পাশে, সামনে পিছনে
সারি সারি পিঁপড়ের সার,

জানিনি আগে, ভাবিনি কখনো
এত লোক জীবনের বলি,
মানিনি আগে
জীবিকার পথে পথে এত লোক,
এত লোককে গোপনসঞ্চারী
জীবন যে পথে বসিয়েছে জানিনি মানিনি আগে
পিঁপড়ের সারি
অগণন ভিড়াক্রান্ত হে সহর, হে সহর স্বপ্নভারাতুর !

পাঁচমিনিট, পাঁচমিনিট মোটে
কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও
উদ্দাম উধাও
ট্রেন এল বলে' হাওড়ায়।
রে স্টক্ এক্সচেঞ্জের এপারে রেলওয়ের হাওড়া,
তারি মধ্যে বসে আছেন শিবসদাগর
ট্যাক্সির হৃদ্‌স্পন্দে, ট্রাফিকের এটাক্‌সিয়ায়।

এল ট্রেন
মস্থিত করে' রক্তের জোয়ার
আমারই একান্ত মগ্নচৈতন্য মন্থিত করে',

দেখলুম তোমার ক্লোস্-আপ্ মুখ জানলায়,
—একটা কুলি—
শুনলুম যেন ভোরবেলাকার ভৈরবীতে।
হায়রে ! আশার ছলনে ভুলি !
কোথায় তুমি ! ট্রেন ত এল !
কয়লাখনি ধসে' পড়ুক,
ধর্ম্মঘট নাই বা থাম্‌ল,
ট্রেন ত এল !
তোমার কি অসুখ হল ?
তোমার বাবার ?
হঠাৎ দেখি লাব্‌সি
বল্লে, এই যে, কি খবর,
আমার জন্যে এলেন নাকি ?
দিদি আসবে সাতুই।
ভেবেছিলুম তন্দ্রালসা সন্ধ্যার গোধূলি ছায়ায়
ট্যাক্সির নিঃসঙ্গ মায়ায়
ট্রেনের ছন্দে স্পন্দিত তোমার হৃদয়ের গানে
হাতে হাত উষ্ণতায়
করব সেই চরম প্রকাশ, সেই পরম যবনিকামোচন ! হায়রে !
—আমার ফাঁকা লিবিডোকে এখন চালাব কোন্ খেয়ালের
বাঁকা খালে ?
কোন্ ধ্রুপদী অবদমনের নিদ্রাহীনতায় ?

নবজন্ম

হেমচন্দ্র বাগচী

শিশির, দূর্বা, সকালের রৌদ্রে মাকড়সার জালের ঝিকিমিকি—
একটি ছোট মেয়ে কাঁদ্‌ছে—ওয়া, ওয়া, ওয়া—
পেঁপে গাছের ঢাল-ঢাল পাতার উপরে এসে পড়েছে শীতের রৌদ্র।
তা'র নীচে খানিকটা বেড়া দেওয়া জমিতে
পালমশাক, সিম, বড়বটির ক্ষেত—
লাউ-এর মাচা থেকে লাউলতা আর পরিপুষ্ট মসৃণ লাউ
স্তনভারনত রমণীর মত পত্রপল্লবের আবরণে লুকিয়ে আছে।
যেদিকে চাই, একটি স্নিগ্ধ শোভন শ্যামলতা
অস্পষ্টতার আবরণ কাটিয়ে শীতের নীল নির্ম্মল আকাশের নীচে
পাণ্ডুর সূর্য্যালোকে ঝল্‌মল্ করে।

অবনতমুখী পৌষলক্ষ্মী, আর অবারিত প্রাণপ্রাচুর্য্য :
ঝিটা ক্রমাগত বক্ বক্ ক'রে বক্‌ছে—
কে একজন মানপাতার উপরে
ছোট ছোট বড়ি দিচ্ছেন রৌদ্রে পিঠ্ দিয়ে,
খেজুর রসের জন্য ছেলেরা বায়না ধরেছে
মাঝে মাঝে উদাস উত্তরবায়ু ব'য়ে চলেছে
অশথের জীর্ণ পাতা কাঁপিয়ে।

মনে হয়, এই চিরউদাসিনী পৃথিবীতে
আবার নূতন ক'রে জন্মেছি—
ধরিত্রী যেন তাঁর প্রচ্ছন্ন গর্ভাবরণ উন্মুক্ত ক'রেছেন—
তা'রি ফাঁকা দিয়ে নীল অবারিত আকাশ
আর পৌষলক্ষ্মীর প্রসন্ন, সুন্দর মুখ দেখলাম—
জলন্ত সূর্য্যের সিন্দুর-রাগে তা'র ঘন কেশসীঁথি আরক্তিম
পূষণ তাঁর আবরণ উন্মোচন ক'রেছেন,
মনে হ'ল নবজন্ম পেয়েছি।

"স্বপ্নো নু, মায়া নু, মতিভ্রমো নু"

হেমচন্দ্র বাগচী

প্রতিরাত্রে আমি হংসপদিকার গান শুনি
বিরহিণী হংসপদিকা—
বহুবল্লভ দুষ্যন্তের শুদ্ধান্তবিহারিণী।
স্বপ্নে আমি চ'লে যাই কালিদাসের কালে
যখন নদীকান্তারনগরীতে সমাচ্ছন্ন সমৃদ্ধ ভারতবর্ষ
কবির কাব্য যখন মেঘলোক থেকে মাটির পৃথিবীকে
প্রিয়ার পদনখের সঙ্গে উপমা দিতে অধীর—
স্বপ্নে আমি সেই কালে অবতীর্ণ হই
আর গান শুনি হংসপদিকার—
রাজউপবনে বিরহিণী নারীর মৃদু গুঞ্জরণ
মনে হয়, এ স্বপ্ন, না মায়া, না মতিভ্রম!

প্রতি রাত্রে আমি আমার প্রিয়তমার গান শুনি
প্রোষিতভর্তৃকা প্রিয়তমা—
গৃহবাতায়নপার্শ্ববর্তিনী কল্যাণী বধূ—
স্বপ্নে আমি নেমে আসি আধুনিকের কালে
যখন পীড়াজর্জ্জর ত্রস্ত জীবনে অবসর দুর্লভ,

কবির কাব্যে যখন আর প্রিয়া নেই
প্রিয়ার পদনখ যখন আর সম্মানিত হয় না কবির কাব্যে
বিচিত্র সুন্দর উপমায় আর অলঙ্কারে ;—
তখন আমি গান শুনি—
ভীত দাসজীবনের গান—
কঙ্করে আর তপ্ত মরুবালুকায়
দুঃখিনী প্রিয়তমার মুখের রেখা অঙ্কন করি
মনে হয়, এ বিরহ, না মিলন, না মৃত্যু!

প্রলাপ

হেমচন্দ্র বাগচী

রূপালি জ্যোৎস্নাধারায় কতগুলি পাখী উড়ে গেল—
দূর বনান্তরের দিকে।
অদ্ভুত চাঁদের আলো পড়েছে নারকেলগাছের জিরিজিরি পাতার উপর
রৌপ্যশুভ্র আলো এবং পত্রান্তরালের ঘন অন্ধকারের আল্‌পনা—
তা'রা কোন্ দেশের পরী, যা'রা এই আল্‌পনা দেয়?

ট্রেন লাইনের দু'পাশেই গ্রাম—
ঘন বনের মধ্যে দৃষ্টি চলে না।
পুরোনো ভাঙা ভাঙা বাড়ী
কত পরিচিত অপরিচিত গাছে মেশামিশি
চাঁদের আলো সেই গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করেছে।

মানুষ জেগে থাকে না কেউ,
অন্ধকার রাত্রে হুইস্‌ল্ দিয়ে ট্রেন আগিয়ে চলে।
ইঞ্জিন থেকে আরম্ভ ক'রে
সমস্ত গাড়ীগুলোর উপরে পড়ে
রৌপ্যশুভ্র চাঁদের আলো।

গাড়ীর ধাবমান ছায়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই আলোও আগিয়ে চলে।
মনে হয়, সারারাত ধ'রে শিশির ঝ'রে পড়ছে
সাহারা মরুভূমিতে
তৃষার্ত্ত মরুভূমি বুঝি স্নিগ্ধ হ'ল।

পোড়ো ভিটের পাশ দিয়ে
সুপ্ত চন্দ্রালোকিত গ্রামের উপর দিয়ে
সর্ষে ক্ষেতের উপর দিয়ে গাড়ী চলে—
চাঁদের আলোর স্নিগ্ধ রৌপ্যশুভ্র রঙ্—
তা'র কাছে যেন সব একাকার হ'য়ে গেছে।

দেবদারু ও চাঁদ

হেমচন্দ্র বাগচী

দেবদারু গাছের পাশ দিয়ে যখন চাঁদ ওঠে
পথ চল্‌তে চল্‌তে মনে হয়—কি সুন্দর!
কোনো সুন্দরী নারীর মুখও বুঝি অত সুন্দর নয়—
আর, তরুণী প্রিয়া যখন মুখ রাখে তা'র মুখের পাশে
তখন মনে হয়, চাঁদও বুঝি অত সুন্দর নয়;
চাঁদকেও ভোলা যায় না, তরুণী প্রিয়াকেও ভোলা যায় না।

আদিম দেবতারা

জীবনানন্দ দাশ

আগুন বাতাস জল : আদিম দেবতারা তাদের সর্পিল পরিহাসে
তোমাকে দিল রূপ—
কি ভয়াবহ নির্জ্জন রূপ তোমাকে দিল তারা;
তোমার সংস্পর্শের মানুষদের রক্তে দিল মাছির মত কামনা।

আগুন বাতাস জল : আদিম দেবতারা তাদের বঙ্কিম পরিহাসে
আমাকে দিল লিপি রচনা করবার আবেগ :
যেন আমিও আগুন বাতাস জল,
যেন তোমাকেও সৃষ্টি করছি।

তোমার মুখের রূপ যেন রক্ত নয়, মাংস নয়, কামনা নয়,
যেন নিশীথ দেবদারু দ্বীপ;
কোনো দূর নির্জ্জন নীলাভ দ্বীপ যেন;

স্থূল হাতে ব্যবহৃত হয়ে তবু
তুমি মাটির পৃথিবীতে হারিয়ে যাচ্ছ;
আমি হারিয়ে যাচ্ছি সুদূর দ্বীপের নক্ষত্রের ছায়ার ভিতর।

আগুন বাতাস জল : আদিম দেবতারা তাদের বঙ্কিম পরিহাসে
রূপের বীজ ছড়িয়ে চলে পৃথিবীতে,
ছড়িয়ে চলে স্বপ্নের বীজ।

অবাক হয়ে ভাবি, আজ রাতে কোথায় তুমি ?
রূপ কেন নির্জ্জন দেবদারু দ্বীপের নক্ষত্রের ছায়া চেনে না—
পৃথিবীর সেই মানুষীর রূপ ?
স্থুল হাতে ব্যবহৃত হয়ে—ব্যবহৃত—ব্যবহৃত—ব্যবহৃত—ব্যবহৃত হয়ে—
ব্যবহৃত—ব্যবহৃত—
আগুন বাতাস জল : আদিম দেবতারা হো হো ক'রে হেসে উঠল :
ব্যবহৃত—ব্যবহৃত হয়ে শূয়ারের মাংস হয়ে যায় ?

হো হো করে হেসে উঠলাম আমি !—
চারদিককার অট্টহাসির ভিতর একটা বিরাট তিমির মৃতদেহ নিয়ে
অন্ধকার সমুদ্র স্ফীত হয়ে উঠল যেন ;
পৃথিবীর সমস্ত রূপ একটা বিরাট তিমির মৃতদেহের দুর্গন্ধের মত
একটা বীভৎস পাঙাশ সমুদ্রের উল্কায় উল্কায়
চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে আর্ত্তনাদ করতে লাগল।

মুহূর্ত্ত

জীবনানন্দ দাশ

আকাশে জ্যোৎস্না,—বনের পথে চিতাবাঘের গায়ের ঘ্রাণ ;
হৃদয় আমার হরিণ যেন :
রাত্রির এই নীরবতার ভিতর কোন্ দিকে চলেছি !
রূপালি পাতার ছায়া আমার শরীরে,
কোথাও কোনো হরিণ নেই আর ;
যতদূর যাই কাস্তের মত বাঁকা চাঁদ
শেষ সোনালি হরিণ-শস্য কেটে নিয়েছে যেন ;
তারপর ধীরে ধীরে ডুবে যাচ্ছে
শত শত মৃগীদের চোখের ঘুমের অন্ধকারের ভিতর।

পাহাড়ের রহস্য

মিহিরকুমার বসু

ঢালু পাহাড়খানি
তার চড়াই উৎরাইয়ের ফাঁকে ফাঁকে
দেখছে ভাঙাচোরা দুঃস্বপ্ন।
আর দূরে দাঁড়িয়ে আছে শ্যামল বনানী
আকাশের নীলিমাকে সে দিবারাত্র বিহ্বল করছে
আপনার রূপের মোহে।
পাহাড়ের পাশ দিয়ে একটা ছোট্ট মেঠো পথ
দিগন্তের উদ্দেশে সর্পিল গতিতে চলে গেছে,
তার উপর দিয়ে ভোরবেলা লাঙল কাঁধে
একটি দুটি কৃষাণ মন্থরগতিতে চলে,
যেমন করে চলে জীবনধারা অলসভাবে
সময়ের সিঁড়ি বেয়ে।

কাল রাতে কিসে যেন পেল আমাকে
শয্যা ছেড়ে উঠে
দাঁড়ালাম বাইরে এসে,

দেখতে পেলাম অস্পষ্ট দৈত্যের মত
দূরে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়খানি
পৃথিবীর বোঝা মাথায় নিয়ে।
হঠাৎ মনে হ'ল যেন রাতের জমাট্ অন্ধকারে
পাষাণ পাহাড় তার বোবা মনের দুয়ার খুলে দিল,
বহুযুগের পুঞ্জিত কথাগুলি
বাতাস বেয়ে ছড়িয়ে গেল আকাশময়,
যেখানে সহস্রকোটি তারা বিরহী পৃথিবীর জমাট্ অশ্রুর মত
টল্‌টল্ করছে আপনার ব্যথার ভারে।
মনে হোলো রাতের অন্ধকার প্রাণ পেয়েছে
বহুদিনের পুরোনো কথাগুলির স্পর্শে;
দূর বনানীর পাতায় পাতায় কোন অব্যক্ত বেদনা
শিরশির করে উঠল।

এমনি রাতের অন্ধকারে,
—যখন পৃথিবীর জীবনস্রোত থমকে থাকে—
এই পাহাড় থেকে উঠে আসে
সহস্র বৎসরের পৃথিবী
সহস্র বৎসরের লুপ্ত কথাগুলি ছাড়া পেয়ে
প্রেতের মত নিঃশব্দে ঘুরে বেড়ায়;

তা'রা স্বপ্ন আনে তারার চোখে,
তা'রা সাড়া তোলে নিঝুম বনানীর মর্ম্মমূলে।

হঠাৎ চম্‌কে দেখি
আলোর রেখা ফুটে উঠেছে দূর আকাশে,
নীড়ের বাঁধন ছিঁড়ে পাখীগুলি
একটি ছুটি করে বেরিয়ে পড়ছে আকাশে,
ঘুমন্ত পৃথিবী তার স্বপ্ন ভেঙে নড়ে চড়ে উঠ্‌ছে।
হঠাৎ কি শিহরণ যে পাহাড়ের বুকে লাগল,
বন্ধ হল তখনি তার মনের দুয়ার,
তারারা ডুব দিল সব আলোর স্রোতের তলে,
আর মুখর বনস্পতির দল
কিসের লজ্জায় যেন নীরব হোলো।
তাকিয়ে দেখি ঢালু পাহাড়খানি দাঁড়িয়ে আছে
চিরকালের মত নিশ্চল, নিথর।

প্রতিষ্ঠা

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

করেছি একটা সাংঘাতিক পণ,
শোনো তোমরা।
বিশ্বাস না হয়, মিছে হেসো না
চুপ্‌টি করে শোনো।
দোহাই তোমাদের, তর্ক তুলো না—
তর্কে দেবতা মেলে না।
সরস্বতীকে ঘরে আন্‌বো
পণ করেছি আমি।
অপ্রতীত স্বপ্ন মনে হয়? শোনো তবে—
মরাল-বাহনা সে নয়,
মরাল-গমনা।
হাতে তার বীণা নেই,—কণ্ঠে আছে মধু।
বাণী একটু অস্ফুট—হয়তো শুদ্ধ নয়,
কেমন যেন জড়িয়ে-যাওয়া।
তা' হোক্‌,
প্রস্ফুটনী অধর দিয়ে শোধন করে নেবো।

···হাসির কথা নয়।
মডার্ন মহাদেব হাসেন আপন-ভোলা হাসি,
মডার্ন গৌরী দেন গালে হাত।
নবীন তপস্যার সিদ্ধি শুনে
হেসে দেন উড়িয়ে সকল
আশা-জল্পনাকে।
বলেন—"পাগল! বামন হয়ে চাঁদে হাত!
স্থির করে রেখেছি যে আমরা
সরস্বতীকে দেবো তারি হাতে—"

—যিনি আস্‌ছেন—শীঘ্রই আসছেন
ক্ষীরোদ-সাগর পার থেকে।
গলায় দোলে সিবিল্ সার্বিসের
গজমোতির মালা।
এক হাতে শাশুড়ীর বরাভয়-শঙ্খ,
অপর হাতে স্বদেশী কূটনীতির
মন্ত্রছেদন চক্র।

আর এক হাতে শ্বশুর-নিপীড়ন
যৌতুকের গদা—
শেষ হাতে কাল্‌চ্যরের
বিদেশী শ্বেতপদ্ম।

হায় রে! আমার শুধুই লীলাকমল।
চার বনাম এক।
কিন্তু তোমাদের আশীর্ব্বাদে তাইতেই হয়েছে কাজ।
অই দেখো—লোধ্র-রেণু লেগে আছে
সরস্বতীর দেহে, পরিপাণ্ডুর কপোলে।
তোমরা শোনো, যারা হেসেছিলে—দেবী আমার স্তবেই তুষ্ট।
হবে না? সিদ্ধি যে আমার কৃচ্ছ্রজয়ী।
কালিদাসের অনুগত শিষ্য—
চায়ের পেয়ালায় স্তোত্রযোগে মিশিয়ে দিয়েছি
বেশ একটু আদিরসের ঝাঁঝ।

লক্ষ্মীদিদির সঙ্গে আমাদের উভয়েরই কলহ।
বাপ-মায়ের সুয়ো-মেয়ে তিনি থাকুন্ গে,
তাঁর ত্রিলোক-পালন হাকিম-স্বামীর বুকে
কৌস্তুভমণিরূপে।

আমরা থাক্‌বো দূরে দূরে—বৈকুণ্ঠের উপকণ্ঠে
কমলবনের পাশে—বাণীর গৃহে।

আগামী শীতশেষেই তাকে ঘরে আন্‌বো
পণ করেছি—আর দেরী নয়।
ইতিমধ্যে কখন কি ঘটে
বলা তো যায় না!
বসন ছুপিয়ে রেখেছি বাসন্তীরঙে
তাতে পড়েছে অমলা শিউলীর
রঙীন্ ফোঁটা।
তোমাদের রইলো নিমন্ত্রণ—
হেসো কিন্তু এসো,
যেন ভুলো না।

বন

লীলাময় বসু

মহুয়াবনের মর্মরানি
ডালে ডালে হরেক্ রকম পাখীর কিচিরমিচির ধ্বনি,
একটু পরে সন্ধ্যা নামে
সবুজের তরঙ্গ যেখানে নীলাকাশের সঙ্গে মিশেছে,
মোহময়, অপরূপ সন্ধ্যা,
শিশির-ভেজা পদ্মের পাপড়ি-মেলার মতো
সন্ধ্যার উন্মীলন।
তারপর, একেবারেই স্তব্ধ গভীর রাত্রি।
পথে, পথপ্রান্তে, বনমধ্যে
খসে-খসে পড়ে স্তব্ধতার চূর্ণ,
অন্ধকার পড়ে ঝুর্‌ঝুর্ করে শিশিরের সঙ্গে।

এখন, তুমি আমায় ডাক্‌ছো—
কামনার অরণ্যের নিস্তব্ধতায়।
তারপর, বনমধ্যে অন্ধকারের স্তব্ধতা,

আর রাত্রির অরণ্যে
কামনার তীক্ষ্ণ সাপের সঞ্চরণ।
ক্রমেই ঘন অন্ধকারে রাত ভরে উঠ্ছে
তোমাকে ঘিরে কামনার উৎসব।
হঠাৎ দেখ্তে পাই
তাদের সমারোহ চলেছে।—
সাম্‌নের রাস্তা থেকে আস্‌ছে আলোর রেখা
সন্ধানী চোখের মতো,
তুমি বন থেকে বেরিয়ে পড়্‌লে,
তোমার চুলের দুরন্ত গন্ধ
এখনো আমাকে মাতাল করে রেখেছে।
এলোমেলো ঝাপ্‌টা দিচ্ছে চারদিকে
মহুয়ার দুরন্ত গন্ধকেও সে হার মানিয়েছে।

মনুমেণ্ট

সুশীলকুমার ঘোষ

কত অশ্রুত অশ্রুর প্রকাশিত ইতিহাস,
সুন্দর বধূর রক্ত আর রক্তের মত লাল সিন্দুর
ভাঙা শাঁখার ভগ্নস্তূপ আর
পুঞ্জীভূত জমাট চোখের জল—এই মনুমেণ্ট।

রাজার রাজসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখ্তে
মত সৈনিক নিজেদের করেছে জীবনান্ত
তাদের আত্মার ব্যঙ্গময় সান্ত্বনা এই মনুমেণ্ট্।

মাটি যারা পায়নি, এত শীগ্‌গির মাটি হতে যারা চায়নি,
কোন অজ্ঞাত কোণে ফেলেছে যারা যন্ত্রণাকাতর শেষ নিঃশ্বাস,
তাদের সম্মিলিত একটি কবর.এই মনুমেণ্ট।

এই ইঁট-কাঠ-পাথর সিমেণ্টে,
চাপা দেয়া আছে কত সঙীনের টুক্‌রো, কত বুলেট
গোলাগুলি বিষাক্ত গ্যাস আরো কত কী
—এক কথায়, মহাযুদ্ধের কলঙ্কিত ইতিহাস
তার কালির পশরা মাথায় ক'রে আছে
গর্ব্বোদ্ধত উন্নত এই মনুমেণ্ট।

আমি এর পাশে দাঁড়িয়ে শুন্‌তে পাই
সঙীনাহত সৈনিকের মৃত্যুযন্ত্রণা—
—যার নিঃশব্দ প্রেত এই মনুমেণ্ট্—
আধমন ওজনের জামাকাপড়ের তলায়
যার উষ্ণরক্তস্রোত ক্রমে হয়ে আস্‌ছে শীতল তুহিন,
পিঠে যার বাঁধা আছে জলের 'ফ্লাস্ক্'
কিন্তু সামর্থ্য যার নেই হাত বাড়িয়ে তা থেকে জল নেবার,
চোখে যার অন্তিমকালে ভেসে উঠ্‌ছে
নিরাকার ঈশ্বরের কল্পিত রূপ নয়
—যে ঈশ্বর তার মৃত্যুকালে ঠোঁটে জল তুলে দেয় না—
তার লোলুপ চোখে প্রতিচ্ছবিত হচ্ছে
প্রিয়ার সেবাসুনিপুণ রূপ,
প্রিয়ার বিদায়কালীন শেষ চুম্বন।

জীবনযুদ্ধে অকৃতী সৈনিক আমরা—
আমরাও আমাদের অক্ষমতা,
দৈনিক দৈন্যের ইতিহাস,
ঋণ আর অকৃতকার্য্যতার ভাষায়
লিখে রেখে যাব—
—আমাদের পরবর্ত্তী পুত্রপুরুষের মনুমেণ্ট!

সূর্য্যমুখী

দ্বিজেন্দ্র মৈত্র

আজ তো মেঘে আকাশ ঢাকা,
কার দিকে মুখ তুলে ধরবে তুমি সূর্য্যমুখী?
মাটির রসে পূর্ণ হ'ল দেহ
পাপড়িগুলো খুলে গেল ধীরে ধীরে।

ঊর্দ্ধমুখী হয়ে চেয়ে রইলে পূবদিগন্তে
সে মুখ ঢলে পড়লো পশ্চিমের দিকে
তবুও সূর্য্যস্নানে শুচি হ'ল না দেহ
মাঝে মাঝে তৃষ্ণায় বুকের ভিতর উঠ্‌ছে থরথরিয়ে কেঁপে।

অপলকে চেয়ে রইলে পশ্চিম আকাশে,
যদি কখনো ছিন্ন মেঘের ফাঁক হ'তে
তোমার বুকের পরে এসে পড়ে শেষ রক্তিম দাক্ষিণ্য
সমস্ত দিনের প্রতীক্ষা সার্থক হবে, এই কামনা।

বাঁশী

দ্বিজেন্দ্র মৈত্র

কুয়াশা জড়ানো শেষরাতে, শুক্লা ত্রয়োদশীর
নিভে আসা চাঁদের পাণ্ডুর হাসি যখন ছড়িয়ে আছে,
এমন সময় বেজে উঠলো বাঁশী, কলের বাঁশী
ঘুমন্ত সহরের শেষ প্রান্তে, শুরকীর মিলে।

আচমকা ঘুম ভেঙে বুকের ভিতর কেঁপে উঠলো।
প্রত্যহ এমনিই বাজে, কুলীদের ঘুম ভাঙানো বাঁশী।
নিশীথ নগরীর প্রশান্তিকে ছিন্নভিন্ন ক'রে
রক্তাক্ত নখরে বিদীর্ণ ক'রে বেজে চলেছে বাঁশী।

এমনি ক'রেই কলের বাঁশী রোজ বেজে ওঠে
প্রভাতের সূচনায়। কুলিরা জেগে ওঠে।
না—না—পারলুম না। নিষ্ঠুর বাঁশী, তুমি থামো
তোমার ঘুমভাঙানো, তীক্ষ্ণ, শাণিত সুর থামাও।

এ তো বাঁশী নয়, যেন জলন্ত গলিত আগুনের স্রোত
কানের মধ্যে দিয়ে আত্মায় প্রবেশ করছে
দগ্ধ করছে, জালিয়ে দিচ্ছে সমস্ত শরীরকে,
অব্যক্ত বেদনায় সমস্ত শরীর নীল হয়ে আস্‌ছে।

আমার শেষরাতের স্বপ্নকে তুমি বিষাক্ত কোরো না
এখনো তো সূর্য্য ওঠেনি, একটু ঘুমোতে দাও।
তোমার নিষ্ঠুর সুরে আত্মাকে আর নির্য্যাতন কোরো না
রাতের গভীরে তাকে একটু বিশ্রাম দাও।

পূব আকাশে পাংশু বিবর্ণতা ফুটে উঠ্‌ছে ধীরে ধীরে
এখনই জেগে উঠ্‌বে সহর উন্মাদ কোলাহলে।
নিষ্ঠুর বাঁশী! তুমি থামো, থামো, করুণা করো
তোমার ও ঘুমভাঙানো পৈশাচিক সুর থামাও।

প্রার্থনা

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

হে বিধাতা,
অতিক্রান্ত শতাব্দীর পৈতৃক বিধাতা,
দাও মোরে ফিরে দাও অগ্রজের অটল বিশ্বাস।
যেন পূর্ব্বপুরুষের মতো
আমিও নিশ্চিন্তে ভাবি, ক্রীত, পদানত,
তুমি মোর আজ্ঞাবাহী দাস।
তাদের সমান
মণ্ডুকের কূপে মোরে চিরতরে রাখো, ভগবান।
কমঠবৃত্তির অহঙ্কারে
ঢাকো ক্ষণভঙ্গুরতা। তাদের দৃষ্টান্ত-অনুসারে
আমিও ধরাকে যেন সরা জ্ঞান করি।
মর্য্যাদার ছিদ্রিত গাগরি
জোড়ে যেন বারম্বার ডুবে আত্মপ্রসাদের স্রোতে।
রৌদ্র জ্যোতি হতে
আবার ফিরাও মোরে তমসার প্রত্ন দায়ভাগে।

ঘুণধরা হাড়ে যেন লাগে
উঞ্ছপুষ্ট জ্যেষ্ঠদের তৈলসিক্ত মেদ;
মরে যেন উদ্বন্ধনে অপজাত হৃদয়ের খেদ॥

পিতৃপিতামহদের প্রায়
তোমার নামের গুণে তীর্ণ হয়ে দশম দশায়
মূঢ়, মূক গড্ডলেরে দিই যেন বলি
রক্তপিপাসিত যূপে।
বাচাল বিদ্রূপে
হুঙ্কারিলে দুর্বৃত্তের উদ্ধত দম্ভোলি,
গুরুজনদের মতো করি যেন সাষ্টাঙ্গ প্রণাম
শক্তির উচ্চল পায়ে; আর্ত্তির সংক্রাম
কেটে গেলে কালক্রমে জনাকীর্ণ রাজপথ থেকে,
স্ফীত বুকে অপ্রতিষ্ঠ পৌরুষেরে ঝেড়ে,
হাসিমুখে হাত নেড়ে
পলাতক সধর্ম্মীরে ডেকে,
প্রমাণিতে পারি যেন সবি তব ইচ্ছা, ইচ্ছাময়॥

এলে পরে লাভের সময়,
সদসৎনির্ব্বিচারে, সকলি তোমার দান ব'লে,

নিঃস্বের স্বেদাক্ত কড়ি হাতায়ে কৌশলে
আমিও জমাই যেন যক্ষসংরক্ষিত কোষাগারে।
শ্রুতিধর মান্ধাতার উক্তির উদ্ধারে
লুকায়ে ইন্দ্রিয়াসক্তি ; অবিমৃষ্য জন্মের জঞ্জালে
বিষায়ে সঙ্কীর্ণ সৌধ ; জলে, স্থলে, নভে
বিরোধের বীজ বুনে ; নিরন্তর নিষ্কাম প্রসবে
ভগ্নস্বাস্থ্য গর্ভিণীর ক্লিন্ন অন্তকালে
তোমার প্রতিভূ সেজে উন্নরক স্বর্গের আশ্বাসে
সাধ্বীর সদ্‌গতি যেন করি।
উর্দ্ধশ্বাস উৎসবের উদ্বায়ী উচ্ছ্বাসে
তোমারে পাশরি,
দারুণ দুর্দ্দিনে যেন পূজা মেনে বিস্ময়ে শুধাই,
"স্মরণে কি নাই,
"দয়াময়, আশ্রিতেরে স্মরণে কি নাই ?"

ভগবান, ভগবান,
অতীতের অলীক, আত্মীয় ভগবান,

অভিব্যাপ্ত আবির্ভাবে আজ
আমার স্বতন্ত্র শূন্যে করো তুমি আবার বিরাজ।
শকুনির ক্ষুধানিবারণে
শস্যশ্যাম কুরুক্ষেত্রে মায়াবাদ ভ'নে
সূচ্যগ্রমেদিনীলোভী যুযুৎসুরে ক্ষমিতে শেখাও
অপরের অপঘাত। তুলে নাও,
আমার রথাশ্বরজ্জু, হে সারথি, তুলে নাও হাতে।
স্বার্থের সংঘাতে
বিতর্ক, বিচার হানো। মর্ম্মে মর্ম্মে, মজ্জায় মজ্জায়
জাগাও অন্যায়, শাঠ্য। হিংস্র অলজ্জায়
পুণ্যশ্লোক সগোত্রের তুল্য মূল্য দাও দাও মোরে।
অপ্রকট সততার জোরে
আমার অন্তিম যাত্রা অতিক্রমি সুমেরুর বাধা
হয় যেন নন্দনে সমাধা,
যেখানে প্রতীক্ষারত সুরসুন্দরীরা
সুকৃতির পুরস্কারে পাত্রে ঢেলে অমৃত মদিরা,
নীবীবন্ধ খুলে,
শুয়ে আছে স্বপ্নাবিষ্ট কল্পতরুমূলে॥

কিন্তু যেথা সর্পিল নিষেধ
স্বপুচ্ছের উপজীব্যে সাধে আত্মবেদ
প্রমিতির বিষবৃক্ষে, অমিতির অচিন্ত্য অভাবে ;
অন্তরঙ্গ জনতার নিবিড় সদ্‌ভাবে
হয়নি বাসোপযোগী অদ্যাবধি যে-নিস্তাপ মরু ;
পশুপতি বাজায়ে ডমরু
মোর গোষ্ঠীপতিদের নাচায়নি যার ত্রিসীমায় ;
নিরালম্ব নিরালোকে যেথা
দেবদ্বিজপ্রবঞ্চিত ত্রিশঙ্কু ঝিমায়,
মৌনের মন্ত্রণা শোনে মৃত্যুবিপ্রলব্ধ নচিকেতা ;
সেখানে আমার তরে বিছায়ো না অনন্ত শয়ান,
হে ঈশান,
লুপ্তবংশ কুলীনের কল্পিত ঈশান ॥

অনন্য

ছায়া দেবী

যেদিন তোমায় দেখেছিলাম,
মধুময় দিন ছিলো জীবনে।

সকালের মেঘ-ভাঙা
স্পর্শ-কোমল বর্ষার আলো
উদ্‌ভাসিত করেছিলো
তোমার মুখটি,
প্রতিভাসিত হয়েছিলো
সে আধো-আলো-আঁধারের মায়া
আমার মনের নিবিড় পরতে।

অপগত কতদিন
তবু তো মলিন হলো না—
সেই মেদুর আলো,
মনের মঞ্জুষায় তোলা আছে এখনো
সোনালী আখরে লেখা

স্মরণের গন্ধ ভারাতুর
ভূর্জপত্রখানি ।

এখন তুমি কতদূরে !
থাকবে কি শুধু পুঁথির পুঁজি ?
উতল মনের বিরল শুদ্ধতায়
মর্মরিয়ে উঠবে সেই বিজন স্মৃতি ?

শিকারী

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মৈত্র

দূরে দেখি পাহাড়ের শিবিরে
উদ্ধত নখরের বিষ,
শার্দূল-পুচ্ছের পীত বিদ্যুৎ
লেলিহান ঘাসের চূড়ায়।
ওক্ আর পাইনের পায়ে জড়ানো
ঠাণ্ডা পাইথনের দড়ি।

পাহাড়ীরা বাসা থেকে
ছুঁড়ে দেয় আকাশের হাতে
ধোঁয়া আর আগুনের হল্‌কা।
জানি না কি প্রতিশোধ নেবে
তারা এই মাংসাশী সন্ধ্যায়।
ঘন ঘন মাদলের শব্দে
রক্ত-পিপাসু বাদুড়েরা
অন্ধকারের ডানা নাড়ে।
থম্‌থমে ভারী ছায়াদের
দেয় ডাক প্রেতলোক থেকে।

হে রাইফেল্‌ধারী !
সাঁইত্রিশ সনের, হে
কোটালকুমার,
জীবনের দুরাশাকে
সন্ধ্যার ফুট্‌পাথে
নিলে কুড়িয়ে,—
দুর্ব্বার ঘৃণার আবেগ,—
ধাবমান ট্যাক্সির বেগে,
বনিয়াদী মোটরের যাত্রী,
টয়লেট্‌ পাউডারগন্ধী,
মরীচিকা-মুখের, মুখর
চকিত দ্যুতির মোহে,
হিমালয় অভিযানে ক্লান্তি,—
হে কোটাল-পুত্র,
নির্ব্বাপিত শেষ প্রহরের
ক্লান্ত নাগরিক—
মরা দুটো হরিণ শাবক
আর, পাথরের মত সব,
গুলিবিদ্ধ পাখীদের,

খড়্‌পোরা পঙ্গু প্রাণ
ভোলাবে তোমায়,
থামাবে কি হত্যার বেগ
ঘৃণামুগ্ধ পাশবিক কুটিল শিরায় ?

নগর দিয়েছে তাই ছুঁড়ে,
হৃদ্‌পিণ্ড হতে,
আগ্নেয়গিরির মত।
তাই ত আমার পথ
বিশাল বনের,
ওক্‌ আর পাইনের নীচে,
স্যাৎস্যেঁতে আর মরা পাতার বুকে।
মাথার উপরে সুগভীর,
মাকড়সা জালে ভরা
শাখা প্রশাখার,
ফেনিল সমুদ্রের ফাঁকে,
ছোট ছোট আকাশের
নীল দ্বীপ টানে অহরহ,
সার্সির মত,
কোন অন্ধ পতনের দিকে।

কাল দেখি সন্ধ্যার আলোতে,
ভুতে-পাওয়া নীল প্রজাপতি,
বসেছে বন্দুকের ঠোঁটে,
মৃত্যুর মধু তাকে টানে।
আর দেখি মনে পড়ে বুনো সন্ধ্যায়,
রক্তাক্ত হরিণ শাবক।
নরম ফলের মত,
তার দুটো চোখের মণির
ধারালো প্রশ্নের স্বর,
পাতাদের বুক ফুঁড়ে আকাশেতে ঠেকে।

তাই আজ অন্ধকারে
নীল প্রজাপতি ওড়ে
ঘুরে ঘুরে মাথার ভিতর,
রক্তমাখা হরিণের চোখ দুটো জলে,
অগ্নিকুণ্ডে কাঁপে হত চোখ।
পশুদের মাংসপিণ্ড পোড়ে,
আগুনের বিসর্পিল পেশী
ঘিরে রাখে বুনোদের মুখ।
অদৃশ্য, কালো, সরীসৃপ,
বুকের ধূসর ঘন শীত
গুলে দেয় রাতের বাতাসে।

চৈত্র-চূর্ণি

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মৈত্র

যখন অন্ধকারের উপর পা ফেলে ফেলে
তোমার কথাগুলি আসে,
অমাবস্যার রাত্রে
স্রোতের মুখে গা ভাসিয়ে দেওয়া
ছোট ছোট জেলেডিঙির মত,
তখন আমি প্রসাধনের ভিড়ে
জড়ো করছি,
নতুন নাগরের বৈদ্যুতিক ইসারা,
যখন অন্ধকারের পিঠে ভর করে
তোমার শাপগুলো আসে।

বৃহদারণ্যক পড়েছি।
প্রজাপতির দ্বিতীয় গেল জুটে।
প্রজাদের জুটলো,
কালো পর্দার আড়াল
আকাশ থেকে মাটিতে।
তার দুই পাশে,
আত্মরক্ষা আর আত্মহত্যার স্রোত,

আমি আর তুমি,
সাম্যবাদ আর ব্রতচারী নৃত্য,
দিবানিদ্রা আর নৈশভ্রমণ—।
তবু বৃহদারণ্যক পড়্‌ছি,
আর কালো কালো,
পর্দাঘেরা মুখগুলি
দুহাতে ঠেলে ঠেলে,
পথ করৃছি।

উৎসবের কুয়াশা ত শেষ হল।
এখন পড়লো শীত।
সাধারণ ও মাধ্যমিক হবার ঋতু।
জাপানী ট্রের উপরে,
ড্রাগনের ভূত-তাড়ানো মুখ,
নির্জন দেয়ালগুলোয়
ক্রুদ্ধ দৃষ্টি ফেলে।
এখন, কর্কশ কম্বল জড়িয়ে,
নিভন্ত চুরুটের ছাইগুলো
ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিই,—
অতগুলো মার্বেল পাথরের মত

চক্‌চকে,
স্খলনশীল,
বিশ্বাসঘাতক
মুখের ছাই।

হে বিহারিণী কাব্যের কবি,
তোমার হাজার হর্স্ পাওয়ারের
ডানার নীচে,
এ ভয় যেন থাকে,
পৃথিবীর আবহাওয়া
তোমায় টান্‌ছে
অজস্র অপমৃত্যু দিয়ে;
তোমার রেশমের মত নরম
জাপানী ঢঙের ওড়ার পেছনে
আন্তর্জাতিক সৈন্যদলের সঙীন্—।
অনেকেই ইতিমধ্যে
নেমে পড়েছেন,
উটপাখীর পদাতিক দলে।
কিন্তু এটা ভুলো না,
মানুষগুলো নিতান্তই মানুষ,
হে বিহারিণী কাব্যের কবি।

অখ্যাত নায়ক

সমর সেন

বাসের সামনে ভিখিরিরা ভিড় করে ;
হাওয়ায় মেঘের শব্দ
আর বৈশাখের বৃষ্টিতে ভেজা অপরূপ সহর।
মোটারের সীটে দেখে শনিবারের বিলাস,
হর্নের আকস্মিক শব্দে
চকিতে ভোলে অমর আত্মার গাম্ভীর্য্য,
মুহূর্ত্তে মুখর রাস্তা পারাপার করে।
রসিদ সামাদের কথা অমৃত সমান,
পরস্ত্রীকাতর চোখ মেলে অস্পষ্ট দেখে
মাঠের অন্ধকারে প্রেমিক ফিরিঙ্গির ভিড়,
আর ব্যর্থতায় বিরস দিনগুলি কাটে।

গম্ভীর শব্দে সহরের উপরে আকাশ কাঁপে,
নীচে বিবর্ণ বস্তি,
আর হলুদ ঘাসের মাঠ।
বৃষ্টির শেষে বিষণ্ণ শান্ত ইন্দ্রধনু,
তবু বারে বারে মনে হয়—
এখানে হাওয়া নেই,
মাটির উপরে গ্রীষ্মের পাতাগুলি কঠিন পাথর।

এখন যুদ্ধ পৃথিবীর সঙ্গে

বুদ্ধদেব বসু

এখন যুদ্ধ পৃথিবীর সঙ্গে, এই পৃথিবীর।
একদিকে আমি, অন্যদিকে তোমার চোখ স্তব্ধ, নিবিড় ;
মাঝখানে আঁকাবাঁকা ঘোর-লাগা রাস্তা এই পৃথিবীর।

আর এই পৃথিবীর মানুষ তাদের হাত বাড়িয়ে
লাল রেখা আঁকতে চায়, তোমার থেকে আমাকে ছাড়িয়ে
জীবন্ত, বিষাক্ত সাপের মত তাদের হাত বাড়িয়ে।

আমার চোখের সামনে স্বর্গের স্বপ্নের মত দোলে
তোমার দুই বুক ; কল্পনার গ্রন্থির মত খোলে
তোমার চুল আমার বুকের উপর ; ঝড়ের পাখির মত দোলে

আমার হৃৎপিণ্ড ; আমরা ভয় করবো কা'কে ?
আমরা তো জানি কী আছে এই রাস্তার এর পরের বাঁকে—
সে তো তুমি—তুমি আর আমি ; আর কা'কে

আমরা দেখতে পাবো ? আমার চোখে তোমার দুই বুক
স্বর্গের স্বপ্নের মত ; তোমার বুকের উপর উত্তপ্ত, উৎসুক
আমার হাতের স্পর্শ ; কূল ছাপিয়ে ওঠে তোমার দুই বুক

আমার হাতের স্পর্শে, যেন কোনো অন্ধ অদৃশ্য নদীর
খরস্রোত ; তার মধ্যে এই সমস্ত দুরন্ত পৃথিবীর
চিহ্ন মুছে যায় ; শুধু এই বিশাল অন্ধকার নদীর

তীব্র আবর্ত, যেখানে আমরা জয়ী, আমরা এক, আমি
আর তুমি—কী মধুর, কী অপরূপ-মধুর এই কথা—
তুমি—তুমি আর আমি।

নবযৌবনের কবিতা

মানুষের জীবনে নবযৌবন স্বভাবতই বিদ্রোহের ঋতু। এত বড় পতিত কোনো মানুষই বোধ হয় নেই যার জীবনে যোলো থেকে কুড়ি বছরের মধ্যে ক্ষণিকের জন্যেও কোনো মহৎ প্রেরণা কি কল্পনা আসেনি। আমাদের দেশের পেন্সনওয়ালা বৈষয়িক বৃদ্ধদের দেখে এ-কথা মনে আনা শক্ত; কিন্তু খুব সম্ভবত ঐ ইন্‌ভেস্টমেন্টের বস্তাগুলোও বয়ঃসন্ধিকালে একবার কোনো ভাবের আগুনে জ্ব'লে উঠেছিলেন। সাধারণ মানুষের সম্বন্ধেই যখন এই কথা, তখন কবিপ্রকৃতিতে নবযৌবন যে হবে আগুনের বন্যার মত সেটা আশাই করা যায়। সাধারণ মানুষের জীবনে সেই ক্ষণিক ও দুর্বল স্ফুলিঙ্গ এক ফুঁয়েই নিবে যায়, তারপর ভুঁড়ি দেখা দেয়, শরীরের মেদ আর ব্যাঙ্কের খাতা এক-যোগে স্ফীত হ'য়ে উঠতে থাকে। নয়তো নানা সংগ্রামে আঘাতে বিক্ষোভে হতভাগ্য জীবনসৈনিক কোথায় যে তলিয়ে যায় তার চিহ্নই থাকে না। আর কবির উদ্দাম নবযৌবনের বিদ্রোহ ক্রমে থিতিয়ে দানা বাঁধে, হ'য়ে আসে গভীর ও গম্ভীর; হয়তো গ'ড়ে ওঠে শান্তি সকল বিরোধ বিক্ষোভ ছাপিয়ে, হয়তো পড়ে কোনো নবনির্মাণের ছায়া। যে-কবির দীর্ঘকাল বাঁচবার সৌভাগ্য হয়েছে তাঁর প্রথম ও শেষ বয়েসের রচনা পাশাপাশি পড়লে এইটেই আমরা দেখতে পাই।

এই বিদ্রোহের ঝোঁক বিভিন্ন কবিতে বিভিন্ন পথ নেয়; কিন্তু মোটের উপর কতগুলো লক্ষণ প্রায় সমান থাকে। পারিপার্শ্বিক জীবনে ও সমাজে যা-কিছু অনুদার ও অশুভ, কুৎসিত ও নিষ্ঠুর, তার বিরুদ্ধে: নিজের মধ্যে যত জটিলতা ও বিরোধ, তার বিরুদ্ধে: ধর্মের, সমাজের ও সাহিত্যের অন্ধ সংস্কারের বিরুদ্ধে: আর সেই সঙ্গে প্রচলিত কাব্যরীতি ভেঙে-চুরে নতুন রূপ ও রীতি-রচনা—কবিকিশোরের প্রথম বিদ্রোহ-বন্যার গতি দেখা যায় এ-সব দিকে। কিছু হয়তো থাকে আতিশয্য, কিছু হয়তো ফেনা; কিন্তু প্রেরণা

যেখানে সত্যিকারের, যেখানে বিশিষ্ট কবি-দৃষ্টি নিজস্ব রীতির সঙ্গে সংযুক্ত, সেখানে আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করি, স্বীকার ক'রে খুসি হই।

সমর সেনের কবিতায় ('কয়েকটি কবিতা' : কবিতা-ভবন : পাঁচসিকা) এই বিদ্রোহের ভাব ও ভঙ্গি স্পষ্ট। প্রথমে রীতির কথা বলি। তাঁর কবিতা গদ্যে, এবং কেবলই গদ্যে। আমার ধারণা ছিলো, পদ্যরচনায় ভালো দখল থাকলে তবেই গদ্যকবিতায় স্বাচ্ছন্দ্য আসে, কিন্তু সমর সেনের মধ্যে এর ব্যতিক্রম দেখলুম। তিনি গদ্যে ছাড়া লেখেননি, এবং কখনো লিখবেন এমন আশাও আমার নেই। এখানে এটা বিশেষ ক'রে উল্লেখ করবার যে তাঁর গদ্য ছন্দ বাঙলা ভাষায় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও নতুন বস্তু। রবীন্দ্রনাথের বা অন্য কোনো কবির গদ্যছন্দের সঙ্গে তার কিছুমাত্র সংশ্রব নেই। আমরা রবীন্দ্রনাথের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার কথা বলি; অর্থাৎ এটা আমরা ধ'রেই নিই যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব আধুনিক বাঙালি কবির প্রচেষ্টায় প্রথমটায় অন্তত অনিবার্য। কিন্তু এই যুবক-কবি রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে কখনোই পড়েননি, সেটা আমার আশ্চর্য্য লাগে। 'কয়েকটি কবিতা'য় রবীন্দ্র-কাব্য থেকে বিভিন্ন পংক্তি প্রায়ই উদ্ধৃত হয়েছে; কিন্তু তার পিছনে আছে বিদ্রূপের সুর। কথাটা আশা করি কেউ ভুল বুঝবেন না। বিদ্রূপটা রবীন্দ্রনাথকে নয়; যে-প্রশান্তি ও বিশ্বাস, যে-তপোবনসুলভ মনোভাব রবীন্দ্র-কাব্যকে গঠন করেছে, বিদ্রূপটা তার উদ্দেশ্যে। 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে', কি 'বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়' রবীন্দ্র-কাব্যে এই হচ্ছে সব চেয়ে বড়ো বিদ্রোহ-বাণী। সেই সময়ে ও-কথা বলতে পারাতেই ছিলো কবির দুঃসাহস ও প্রতিভা, কিন্তু তার পরে আরো অনেক বছর তো কেটে গেছে; এখনকার জীবন নতুন ও ভিন্ন সমস্যা নিয়ে কবির উন্মুখ চিত্তকে মথিত করছে। বাঙলা কবিতায় যে সত্যসুন্দরের ঐতিহ্য এতদিন চ'লে এসেছে তার মধ্যে এই নতুন কবি কোনো অবলম্বন খুঁজে পাননি; গোড়াতে, অন্তত, সেই ঐতিহ্যের বিরুদ্ধেই তাঁকে বিদ্রোহ করতে হয়েছে। সেইজন্যই ঘন-ঘন উদ্ধৃতি ও বক্রোক্তি।

এই ঐতিহ্যটা কী? আমি নিজেও সেই ঐতিহ্যেরই অন্তর্গত; মোটামুটি তার গতিটা বুঝতে পারি। সৌন্দর্য্যের অনুভব ও প্রকাশ, কবিতা বলতে তো আমরা এই বুঝেছি। এর পটভূমিকায় আছে শেলি

কীট্‌স্‌, ব্রাউনিঙ টেনিসন, তা ছাড়া উপনিষৎ আর বৈষ্ণব কাব্য। সৌন্দর্য্যের উপভোগে ও উপলব্ধিতে নিজের ভিতরে যত বাধা, যত মানসিক প্রলোভন ও দুর্বলতা তার বিরুদ্ধে আক্রোশ ও বিদ্রোহ; একদিকে মহৎ ও রোমাঞ্চকর প্রেরণা, অন্যদিকে পঙ্কিল ও ক্ষুদ্র কামনা—এই আত্মবিরোধের তীব্র যন্ত্রণা ও সেই কারণে স্রষ্টার উপর অভিসম্পাত। আমি যে 'বন্দীর বন্দনা' লিখেছিলুম তার মূল কথাটা ছিলো এই।

নিজের কথা উল্লেখ করতে হ'লো: পাঠক মার্জনা করবেন। যে-রকম বয়েসে সমর সেন এই কবিতাগুলো লিখেছেন, সেইরকম বয়েসেই আমি 'বন্দীর বন্দনা'র কবিতাগুলি লিখেছিলুম; এই দুই নবযৌবনের কাব্যমনে-মনে তুলনা করতে ভালো লেগেছিলো। ইতিমধ্যে আট-দশ বছর কেটে গেছে; দেশের হাওয়া আরো কিছু বদ্‌লেছে; তুলনায় এইটেই দেখা গেলো যে 'কয়েকটি কবিতা' অনেক বেশি 'আধুনিক'। 'বন্দীর বন্দনা'র বিদ্রোহ সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত, 'কয়েকটি কবিতা'র বিদ্রোহের উৎস সামাজিক বিরোধ ও শ্রেণী-সংঘর্ষ। নিজের মুক্তির জন্য সমর সেন ব্যস্ত নন্‌, বিধাতাকে অভিশাপ দেবার জন্যও কখনো তাঁর কাব্যে টেনে আনেননি। সৌন্দর্য্যের উপলব্ধির পথে যে-বাধা সেটা তাঁর পক্ষে আত্মবিরোধ মোটেও নয়; সেটা বৃহৎ সমাজ-স্বার্থের সঙ্গে ক্ষুদ্র শ্রেণী-স্বার্থের বিরোধ। 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে' : কবি মনের কথাই তো এ-ই। অপরূপ এই পৃথিবী; কিন্তু সমর সেনের আধুনিক দৃষ্টিতে এই সৌন্দর্য্য অখণ্ড কি অক্ষুণ্ণ নয়। ধনিকের লোভ তাকে মেরেছে, তাকে নষ্ট করেছে রোগ ও দুর্ভিক্ষ, তাকে পঙ্কিল করেছে স্থূল, নির্বোধ মধ্যবিত্ততা, তাকে বিক্ষত করেছে আধুনিক নগর-জীবনের বণিক-শক্তির ব্যভিচারী প্রতাপ আর তারই সঙ্গে হাড়-বের-করা দারিদ্র্যের নির্লজ্জ গ্লানি—এক অন্ধ, অনিপুণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বর্তমান মানবজীবনের ভারসাম্য গেছে উল্টে। এখানে সৌন্দর্য্য আসবে কেমন ক'রে?

উর্বশী

তুমি কি আসবে আমাদের মধ্যবিত্ত রক্তে
দিগন্তে দুরন্ত মেঘের মতো।

কিম্বা আমাদের ম্লান জীবনে তুমি কি আসবে
হে ক্লান্ত উর্ব্বশী,
চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে যেমন বিষণ্ণ মুখে
উর্ব্বর মেয়েরা আসে ;
কতো অতৃপ্ত রাত্রির ক্ষুধিত ক্লান্তি
কতো দীর্ঘশ্বাস,
কতো সবুজ সকাল তিক্ত রাত্রির মতো,
আর কতো দিন !

উপরে যা বলেছি, হয়তো একটু কাঁচা শোনাতে পারে। আমার (কি, আশা করি, সমর সেনের) বলবার কথা কখনোই এ নয় যে মানবসমাজ আজ এই অর্থনৈতিক দুর্ব্যবস্থায় নিষ্পেষিত ব'লে কবি তাঁর নিজস্ব ভাবমণ্ডলে সৌন্দর্য্যকে উপলব্ধি করতে পারবেন না। সমস্তই নির্ভর করে কবির দৃষ্টিভঙ্গির উপর। মুষ্টিমেয় প্রতাপশালী দ্বারা বৃহৎ সমাজের শোষণ এ-পর্য্যন্ত পৃথিবীতে চিরকালই চ'লে এসেছে ; মধ্যযুগে হয়তো তার রূপ আরো ভয়াবহ ছিলো। কিন্তু প্রায় সকলযুগেই এমন কবি দেখা দিয়েছেন, যিনি জীবনের সমগ্র ও চিরন্তন মূল্যকে দেখেছেন ; স্থানীয় ও সাময়িক ঘটনায় আবদ্ধ হ'য়ে থাকেননি। তাহ'লেও এটা সত্য যে কবিও তাঁর যুগেরই সৃষ্টি ; সমসাময়িক সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা, তা ছাড়া কবির নিজের ব্যক্তিগত জীবন, অচেতনভাবেই তাঁর কাব্যের রক্তমাংসকে গ'ড়ে তোলে। এ তো খুব সোজা কথা যে রানি এলিজাবেথের সময়ে ইংলণ্ডের শক্তি ও সমৃদ্ধি আছে তখনকার কবি-নাট্যকারদের গীতি-উচ্ছ্বাস ও বলশালী বেপরোয়া পৌরুষের মূলে ; উনবিংশ শতকে যন্ত্রের বহুল প্রচলন ও বিরাট সাম্রাজ্যস্থাপনের ফলে ইংলণ্ডের ধনোৎপাদন ও প্রজাসংখ্যা প্রচণ্ড বেগে বাড়ানো সম্ভব হয়েছিলো ব'লেই ভিক্টরীয় কবিদের মধ্যে দেখতে পাই জীবনের কতগুলো মূলসূত্রে এমন সুন্দর প্রশান্ত বিশ্বাস। ইংরিজি সাহিত্যে যুদ্ধের পরে কিছুকাল দেখলুম স্বপ্ন-ভঙ্গের ব্যথা ; নির্মোহ, শূন্য অবিশ্বাস ; তার যথেষ্ট কারণ ছিলো। আবার অডেন' প্রভৃতি অতি-আধুনিকদের কাব্যে লেগেছে নতুন স্বর : বর্তমান সময়ে গড়পড়তা মানুষের জীবনের শূন্যতা, দীনতা ও গ্লানি সম্পূর্ণ উপলব্ধি ক'রেও তাঁরা

হতাশ নন্, তাঁদের মধ্যে আছে আশা, আছে নতুন ও সুন্দর পৃথিবী-রচনার আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা। তারও কারণ আছে।

২

বাঙলাদেশের বিংশ শতাব্দীর এই তৃতীয় দশকে যে-কবির যৌবনের উন্মেষ হ'লো, কতগুলো জিনিসের প্রতিক্রিয়া তার মধ্যে প্রবল হওয়াই স্বাভাবিক। সে দেখবে তার চারদিকে মধ্যবিত্ততার ঠাসা দেয়াল ; তার যৌবনের উদ্দামতা যেদিক দিয়ে বেরোতে চাইবে সেদিকেই ঘা খাবে। ভালো পাশ করবে, সম্ভব হ'লে আই-সি-এস্-এ ঢুকবে, নয়তো অন্য কোনো বড়ো চাকরি বাগিয়ে আমলারাজ্যের উজ্জ্বল মণি হ'য়ে রায়বাহাদুরি গোধূলিতে জীবনের অবসান করবে, তার পরিবারের ও সমাজের এ-ই তো উচ্চমত আদর্শ। তার পারিপার্শ্বিক একেবারে বেখাপ্পা, এমনকি প্রতিকূল, তার মনের আগ্নেয় উদ্দীপনাকে ধ্বংস করতে সচেষ্ট। সহরে সে দেখবে বৈশ্য আদর্শের একচ্ছত্র আধিপত্য ; অর্থস্ফীতির কোনো উপায়ই অন্যায় নয়; প্রত্যেকেই নিজ-নিজ স্বার্থের সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণে ব্যস্ত ; ছোট-ছোট গণ্ডির রক্ষিত স্বার্থের খাতিরে বহুর দৈহিক ও আত্মিক বিনাশ। আর দেখবে বড়ো-বড়ো নীতিকথার আড়ালে লাম্পট্য ও স্বৈরাচার, যৌন বাসনার বিকৃতি ও অবমাননা, নিরানন্দ যান্ত্রিক কাজের নিষ্পেষণ আর নিরানন্দ ক্লীব সম্ভোগের ক্লান্তি। কোনোখানে কোনো বড়ো আদর্শ নেই, নেই মানুষের দেহ-মনের সহজ ফূর্তি। সমস্তটা জীবন যেন এক কঠিন নিষ্ঠুর সিস্টেমের অন্ধশক্তির ক্রীতদাস। স্ত্রী-পুরুষের প্রণয়ও তা থেকে মুক্ত নয়।

একটি মেয়ে

আমাদের স্তিমিত চোখের সামনে
আজ তোমার আবির্ভাব হোলো :
স্বপ্নের মতো চোখ, সুন্দর, শুভ্র বুক,
রক্তিম ঠোঁট যেন শরীরের প্রথম প্রেম,
আর সমস্ত দেহে কামনার নির্ভীক আভাস ;

আমাদের কলুষিত দেহে
আমাদের দুর্ব্বল ভীরু অন্তরে
সে উজ্জল বাসনা যেন তীক্ষ্ণ প্রহার।

এই সামাজিক পরিবেশে কবির উন্মীলিয়মান যৌবন পীড়িত হবেই, এবং সেই পীড়া থেকে তার কাব্য হয়তো একেবারে মুক্ত হবে না। সমর সেনের কবিতায় এই অসুস্থতাবোধ খুব বড়ো একটা জিনিস। নাগরিক জীবন আমরা আরম্ভ করেছি অনেকদিন; কিন্তু আমাদের কাব্যে এ-পর্য্যন্ত বেশির ভাগই পাওয়া গেছে রাখাল-বালকের চোখে পল্লীপ্রকৃতির ছবি। নগরের জীবন ও প্রকৃতির খণ্ড-খণ্ড ছবি কি উল্লেখ কোনো-কোনো আধুনিক কবিতে থাকলেও, এতখানি সমগ্রভাবে আধুনিক নগর-জীবন সমর সেনের কবিতাতেই প্রথম ধরা পড়লো। সমর সেন সহরের কবি, কলকাতার কবি, আমাদের আজকালকার জীবনের সমস্ত বিকার, বিক্ষোভ ও ধূসর ক্লান্তির কবি। ঠিক যেন সহরের সুরটি ধরা পড়েছে তাঁর ছন্দে।

মহানগরীতে এলো বিবর্ণ দিন, তারপর আলকাৎরার মতো রাত্রি

* * *

আর কতো লাল সাড়ি আর নরম বুক, আর টেরিকাটা মসৃণ মানুষ,
আর হাওয়ায় কতো গোল্ডফ্লেকের গন্ধ,
হে মহানগরী!
যদি কোনোদিন কর্ম্মহীন পূর্ণ অবকাশে বসন্তবাতাসে
—স্কুল আর কলেজ হোলো শেষ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট জনহীন,
দশটা-পাঁচটার দীর্ঘশ্বাস গিয়েছে থেমে,
সন্ধ্যা নামলো:
মাঝে-মাঝে সবুজ গাছের নরম অপরূপ শব্দ,
দিগন্তে জলন্ত চাঁদ, চীৎপুরে ভিড়;
কাল সকালে কখন সূর্য্য উঠবে!
কলেরা আর কলের বাঁশি আর গণোরিয়া আর বসন্ত

বন্যা আর দুর্ভিক্ষ
শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ—

('নাগরিক')

ম্লান হ'য়ে এলো রুমালে
ইভনিং-ইন-প্যারিসের গন্ধ—
হে সহর হে ধূসর সহর!
কালিঘাট ব্রিজের উপরে কখনো কি শুনতে পাও
লম্পটের পদধ্বনি
কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও
হে সহর হে ধূসর সহর!
লুব্ধ লোকের ভিড়ে যখন তুমি নাচো
দশ টাকায় কেনা কয়েক প্রহরের হে উর্ব্বশী,
তখন শাড়ীর আর তাড়ির উল্লাসে,
অমৃতের পুত্রের বুকে চিত্ত আত্মহারা
নাচে রক্তধারা
আর দিগন্তে জলন্ত চাঁদ ওঠে
হে সহর হে ধূসর সহর।

('স্বর্গ হ'তে বিদায়')

এই কথাগুলোতে আছে সহরের উচ্ছৃঙ্খল তোলপাড়ের প্রতিধ্বনি; আছে তিক্ততা, আছে বিতৃষ্ণা, আছে বিদ্রূপ; আছে বণিক-সভ্যতার চাপে নীরক্ত মানুষের হতাশা আর উন্মত্ততা আর ক্লান্তি: আর আছে দিগন্তে জলন্ত চাঁদের ইসারা—সেটা অগ্রাহ্য নয়।

৩

সমর সেনের রচনায় একটি সতেজ সুন্দর যৌবনকে আমি দেখলুম, তাকে আমার শ্রদ্ধা জানাই। বাঙলাদেশে আজ যেন যৌবনের বড়ো অভাব; পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো যে-অনাসৃষ্টি—"practical young men"—তাদেরই সংখ্যা এদেশে আজকাল মনে হয় বেশি। জীবনের যে সময়টা অসম্ভব ও আজগুবি কল্পনার, সে-সময়টাতেই যারা নিজের মুনফার চুলচেরা হিসেব করতে

বসে, তাদের ভবিষ্যতের কথা ভাবলে আতঙ্কে শিহরিত হ'তে হয়। ভালো পাশদেনেওয়ালা হ'লেই আই-সি-এস্ কি পারতপক্ষে বি-সি-এস্-এর চেষ্টা: তারপর ব্যবসাদারি বিবাহ, মাছের বাজারের মতো দরদস্তুর ক'রে যতটা সম্ভব বেশি আদায়ের চেষ্টা—বৈশ্যমনোভাব আমাদের বিবাহকেও বিষাক্ত করেছে। তারপর আস্তে-আস্তে সেরা পাশকরনেওয়ালারা যখন বড়ো চাকরিতে থিতিয়ে বসেন—এমন একটা সঙ্কীর্ণ, স্বার্থপর, বুদ্ধিহীন সম্প্রদায় তাঁরা গ'ড়ে তোলেন, যা হয় আমাদের জীবনের যে কোনোরকম বিকাশের অতি বড় বিরোধী শক্তি। আমাদের দেশে যেন যৌবনই নেই: আমরা বুড়ো হ'য়ে জন্মাই, যদিও সাধারণত বুড়ো না-হ'য়েই মরি।

এরই মধ্যে 'কয়েকটি কবিতা'য় বিদ্রোহী নবযৌবনের দেখা পেলাম। প্রচলিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এ-বিদ্রোহ নিশ্চয়ই নতুন নয়; কিন্তু বাঙলাভাষার কবিতায় স্পষ্ট ও তীব্র হ'য়ে এ-প্রতিবাদ এই প্রথম বাজলো। প্রথমদিককার কবিতাগুলো একটু যেন অস্পষ্ট; সেখানে ঠিক সুরটাই আমরা শুনি, কিন্তু সে-সুর বিশেষ কোনোখানে যেন নিয়ে যায় না। সুরে ধরা পড়েছে হঠাৎ মনের এক-একটা ঝোঁক; এবং সেই সুর একটা বিশেষ জিনিস। কেননা সে-সুর সমর সেনের নিজস্ব সৃষ্টি। বাঙলা গদ্যছন্দকে যে-রূপ তিনি দিয়েছেন, সেটা আর কারুরই নয়; তিনি আবিষ্কার করেছেন এই ছন্দের অভিনব ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি। এ-গদ্য ঠিক গল্প কি প্রবন্ধের গদ্যই নয়; এ একেবারেই আলাদা জিনিস, প'ড়ে মনে হয় এ যেন বিশেষরূপেই কবিতার বাহন। 'কয়েকটি কবিতা' বইখানা ছোটো, কবিতাগুলোও ছোটো-ছোটো, একটি ছাড়া প্রায় সমস্তই কয়েকটি লাইনে পর্য্যবসিত। কবিতার এই রূপটা এত নতুন যে প্রথমটায় আশ্চর্য্য লাগে। এবং এই ছোটো বইখানার মধ্যেই আছে মন্থর কিন্তু স্পষ্ট পরিণতির আভাস। যেটা বলেছিলুম অস্পষ্টতা, সেটা কাব্যের রূপটাকে দখলে আনবার চেষ্টার প্রাথমিক অবস্থা, তা ছাড়া কিছু নয়। অল্প পরেই দেখা যায়, দখল পাকা হয়েছে, তখন দেখতে পাই ভিতরকার কথাটা ছন্দের লীলার ফাঁকে-ফাঁকে চাপা আলোর মত বিচ্ছুরিত। শক্তিশালী তরুণ কবি প্রথম উচ্ছ্বাসের ঝোঁকে যে-আতিশয্য ক'রে থাকেন—এবং যে-আতিশয্য অবশ্যই মার্জনীয়, এমন কি শ্রদ্ধেয়—অবাক হ'য়ে দেখছি

এই রচনাগুলিতে তার কিছুমাত্র আভাস নেই। প্রায় প্রথম থেকেই এই পরিণত আত্মপ্রত্যয়ের ভাব শক্তিশালী কবিতেও বিরল। সেটা আছে ব'লেই সমর সেনের প্রভাব আঙ্গিকের ও ভাবের উভয় দিক থেকেই নতুন উদ্যোগীদের মধ্যে তো খুবই বেশি, কখনো-কখনো প্রতিষ্ঠাবান কবিতেও দেখা যাচ্ছে—যদিও তাঁর রচনা ছাপার অক্ষরে বেরুচ্ছে মোটে দু'বছর ধ'রে।

এ-কথাও বলবো যে সমর সেনের পরিণতির এটা প্রথম পরিচ্ছেদ মাত্র। আরো অনেক কিছু তাঁকে করতে হবে। 'কয়েকটি কবিতা'র রচনাগুলো মোটামুটি এক ধরণের; অনেক কথার, বিশেষণের ও উপমার পুনরুক্তি দেখা যায়। সেটা অবশ্যতই দূষ্য নয়। বিশেষ কতগুলি কথার পুনরুক্তি স্বকীয় প্রতিভারই ফল। কিন্তু পরিবর্তন দরকার; পরিবর্তনের ভাঙাচোরাতেই তো পরিণতি ও নতুন গঠন। কোনো কবি হয়তো একটা কাব্যরূপ একবার পেয়ে যান—তারপর সেটারই মোহে আবদ্ধ হ'য়ে পড়েন, তারপর সুরু হয় নিজের অনুকরণ। এটা বড়ো শোচনীয়। বাঙলা কাব্যে এর চমৎকার উদাহরণ 'মরীচিকা'র যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। নিজের সৃষ্টিকে ছাড়িয়ে যেতে না-পারলে বড়ো কিছু করা যায় না; এর শ্রেষ্ঠ উদাহরণ রবীন্দ্রনাথ। সমর সেনের এখন একটা মোড় নেবার সময় হয়েছে। যা তিনি এখন পর্য্যন্ত করেছেন, তা থেকে ছুটে বেরিয়ে তাঁকে যেতেই হবে। লম্বা কবিতা তাঁকে লিখতে হবে; ছোটো-ছোটো রচনার নিজস্ব মূল্য যতটাই হোক্, তাতে গঠনের ক্ষেত্র কম, এবং বড়ো কাব্যে গঠনশক্তি খুব একটা বড়ো জিনিস।

> অনেক, অনেক দূরে আছে মেঘমদির মহুয়ার দেশ,
> সমস্তক্ষণ সেখানে পথের দুধারে ছায়া ফেলে
> দেবদারুর দীর্ঘ রহস্য,
> আর দূর সমুদ্রের দীর্ঘশ্বাস
> রাত্রের নির্জ্জন নিঃসঙ্গতাকে আলোড়িত করে।
> আমার ক্লান্তির উপরে ঝরুক মহুয়া-ফুল,
> নামুক মহুয়ার গন্ধ।
>
> ('মহুয়ার দেশ')

মদনভস্মের প্রার্থনা

মাস্তুলের দীর্ঘরেখা দিগন্তে,
জাহাজের অদ্ভুত শব্দ,
দূর সমুদ্র থেকে ভেসে আসে
বিষণ্ণ নাবিকের গান।
সমস্ত দিন কাটে দুঃস্বপ্নের মতো ;
রাত্রে ধূসর প্রেম : কুসুমের কারাগার।
কতো দিন, কতো মন্থর দীর্ঘ দিন,
কতো গোধূলি-মদির অন্ধকার,
কতো মধুরাতি রভসে গোঙায়নু,
আজ মৃত্যুলোকে দাও প্রাণ
দূর সমুদ্র থেকে ভেসে আসে
বিষণ্ণ নাবিকের গান।

—সমস্ত বই থেকে সব-চেয়ে-ভালো কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করলাম। গদ্যের ছন্দটা নিখুঁত ; পর-পর কয়েকটা জোরালো রেখায় ফুটে উঠেছে গভীর ইঙ্গিতময় ছায়াছবি। আশা করি যে-নাবিকের গান কবির কানে এসে পৌঁচেছে, তার টান তাঁর কাব্যকে নিয়ে যাবে দূর সমুদ্রে, জয় করবেন তিনি নতুন কল্পনার উপনিবেশ, বাঙলা কাব্যকে দিগন্তবিহারিণী করবেন ঢেউয়ের ধাক্কায় আর ঝড়ের ঝাপটায়। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব চিহ্নমাত্র নেই এমন কবি আজ একজন যখন দেখা গেছে, ক্রমে-ক্রমে আরো দেখা যাবে নিশ্চয়ই—তাঁদের ভাব ও ভঙ্গি, বিষয়বস্তু ও দৃষ্টি সবই হবে অন্যরকমের। আর এইদিকেই যদি পরিণতি হয় (এবং মনে হচ্ছে যে তা-ই হবে) তাহ'লে বাঙলা কাব্যে সম্পূর্ণ এক নতুন দিন বেশি আর দূরে নয়। বাঙলা কবিতার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে খুব বড়ো আশা হচ্ছে।

সম্পাদক : বুদ্ধদেব বসু : প্রেমেন্দ্র মিত্র : সহকারী সম্পাদক : সমর সেন
৫ ও ৬ চিন্তামণি দাস লেন শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস হইতে প্রভাতচন্দ্র রায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কবিতা

দ্বিতীয় বর্ষ

অজিত দত্ত